হৃদয়ের কথা

শহীদ আখন্দ

নাস্তার টেবিলে এসে সোফিয়া দেখল, আব্বা হাত গুটিয়ে বসে আছেন। দুই হাত মুঠি করে তার ওপর দুই গালের ভর চাপিয়ে রেখেছেন। তার দু'চোখ বন্ধ। সোফিয়ার পায়ের শব্দে তিনি চোখ খুললেন, তাকে দেখলেন। তার চেয়ারে বসে সোফিয়া দেখল, আটার রুটি, ঢেঁড়স-সিদ্ধ আর ডিম পোচ। তার মেজাজ খারাপ হলো। চেয়ারে শব্দ তুলে সে উঠতে গেল, চাপা বিরক্তিতে ডাকল,আম্-মা-!

মিনহাজ সাহেব বললেন, উঠিস্ না। তোর মা এক্ষুণি এসে পড়বে।

বলতে বলতে রাজিয়া এসে তার চেয়ারে বসতে যাবেন, সোফিয়া বলল, এ-ই!

রাজিয়া বসতে বসতে বললেন, গোস্ত গরম করে আনছে।

কুলসুম ধোঁয়া-ওঠা তরকারির বাটি এনে টেবিলে রাখল। সোফিয়া ওটা দেখেও খুব উৎসাহিত হলো না, বলল,পাউরুটি নেই কুলসুম।

রাজিয়া বললেন, আছে। রোজ রোজ একই জিনিস খেতে খারাপ লাগে না?

সোফিয়ার একটু জিদ হলো। সে বলল, দুটো পাউরুটি সেঁকে নিয়ে আয়।

মিনহাজ সাহেব খেতে শুরু করেছেন। তার খাওয়ার দিকে তাকাল সোফিয়া। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আব্বার খাওয়াটা এত সুন্দর। যা-ই খান্ না কেন, এত এনজয় করে খান, পেটে খিদে না থাকলেও জিহ্বা জলে ভরে ওঠে। অই সবুজ ঢ্যাবঢ্যাবে ঢেঁড়স চামচ দিয়ে তুলে তুলে মুখে পুরছেন আর আলতো করে চিবোচ্ছেন। আম্মা প্লেটে গোস্ত তুলে একটা রুটি নিলেন, তারপর ঝোল মাখিয়ে মুখে পুরলেন। তিনিও কম খান না। তারপর গোস্তের টুকরায় কামড় দিয়ে তাকালেন সোফিয়ার দিকে। সোফিয়া ঘাড় ফিরিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল।

রাজিয়া বললেন, এবারের গোস্তটা খুব সুন্দর ছিল। সফ্‌ট, কচকচে।

তিনি এক টুকরা গোস্ত সোফিয়ার পাতে তুলে দিলেন, দ্যাখ তো একটু জিভে লাগিয়ে। কুলসুমের রান্না আমাদের দেশের বাড়ির রান্নার মতো।

সোফিয়া গোস্ত মুখে দেয়। তারপর বাটি থেকে আরো তুলে নেয়। তারপর রুটি নেয়।

রাজিয়া বললেন, ওটাতে পরোটা আছে, গরম।

সোফিয়া কিছুক্ষণ খেয়ে সবজি তুলে নেয়। সে আব্বার মতো মুখে পুরে আলতো করে চিবোয়। তাকায় আব্বার দিকে। মিনহাজ সাহেব একটু হাসলেন। তারপর একটা পরোটা তুলে নিলেন। সোফিয়া তাকে অনুসরণ করল।

কুলসুম যখন অবশেষে টোস্ট করা পাউরুটি এনে হাজির করল, সোফিয়ার তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। হাত ধুয়ে সে নিজের ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসল। তাকাল ডেকসেটের দিকে। গান শুনলে মন্দ হয় না। টেলিভিশনের দিকে চোখ গেল। টিভি অন্ করবে? বিরক্ত হলো সে। এই টেলিভিশনটা ভীষণ বিশ্রী একটা নুইসেন্স। ঢাকার সব চ্যানেল সস্তা ভাঁড়ামি আর একঘেঁয়ে বিজ্ঞাপনে ভর্তি। বোম্বাই মানে বিশ্রী সব নাচ। আর কলকাতা একটানা চমকহীন চমকের চেষ্টায় ভর্তি। ইংরেজি ভাল, কার্টুন ভাল। কিন্তু ইংরেজিটা আর একটু ভাল জানা থাকলে ভাল হতো। এটা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। কেন যে ছাই সে বাংলা মিডিয়ামে এত পড়া পড়ল। মনে হচ্ছে এমএ পাস করে সে মূর্খই থেকে গেছে।

দরজায় নক করে কুলসুম ঢুকল, চা এখানে নিয়ে আসবো?

-আব্বা-আম্মা টেবিলে আছে?

-হ্যাঁ।

-ঘেমে গেছিস?

-ঘামব না। রান্নাঘরে এসি দিচ্ছেন?

চা নিয়ে আসবো?

-না, আমি আসছি। এই শোন্।

কুলসুম আবার ঢোকে, সোফিয়া বলে, আব্বা-আম্মা হাসাহাসি করছে নাকি রে?

কুলসুম হাসতে গিয়ে হাসে না, গম্ভীর হয়ে বলে, কই, না তো!

আব্বা-আম্মা চা খেয়ে চলে গেছে।

নিজের চেয়ারে বসে চায়ের কাপে সোফিয়া অলস ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছে। সারাদিনের জন্য একটা প্রোগ্রাম করে নেয়ার কথা ভাবছিল সে। কিন্তু শুরুটাই সে করতে পারছে না। এখন এই চাটুকু শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে কি করবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। এরকম কর্মবিহীন অলস সময় কাটানোর কষ্ট আছে। কষ্ট, বিরক্তি, অসহায়ত্ব। এমএ পাস করে এমনি করে অর্থহীন বসে থাকায় গ্লানি নেই? বিশেষ করে বিয়ের জন্য অপেক্ষা করায়? এর মধ্যে অনেক ক'টা সম্বন্ধ এসেছে। আব্বারই পছন্দ হয়নি, তো সোফিয়া। আব্বার পছন্দ হলে তার আর পছন্দের প্রয়োজনই হবে না। তাই কি? ধুর, তাই কি হয়? সে দেখবে না? কথা বলবে না?

আব্বা বলেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যে অভিজাত এই আবাসিক এলাকাটি আজেবাজে, বিশ্রী, অশ্লীল মানুষে ভরে গেছে। কেউ বলে না, কিন্তু এলাকার আদি বাসিন্দে সবাই জানে, এরা প্রায় সবাই হঠাৎ বড়লোক হয়েছে। বড়লোক মানে, হঠাৎ হাতে টাকা এসেছে সন্দেহজনক পথে। হাইজ্যাকিং, খুন, ব্যাংক ডাকাতি থেকে

মেইনলি। কিছু কিছু আছে অসৎ অফিসার। তা ওরাওতো সেই একই অভিন্ন গোত্রেরই। ফলে কে যে ভাল, কে যে মন্দ, এটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে গেছে। বাবা কি করে? তার বাবা কি করতেন? এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে এমন চোখ লাল করে তাকায় না! বুকের ভিতরে হিমশীতল ভয় রক্তবেগ মন্দ করে দেয়। এর মধ্যে একটা খুব ভাল প্রস্তাব এসেছিল। ছেলের নিজেরই গার্মেন্টস আছে। চার পাঁচ কোটি টাকা লগ্নি করা আছে। রপ্তানির ভল্যুম বিরাট। ছেলেটি ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত। কেন যে মিনহাজ সাহেব তার সম্বন্ধে ব্যাংকে খবর নিতে গেলেন! না গেলে বিয়েটা দিব্যি হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু ব্যাংকে যার চৌদ্দ পনেরো কোটি টাকার ঋণ, ঋণখেলাপির তালিকায় যার নাম আছে, তার কাছে সোফিয়াকে জেনেশুনে ছেড়ে দিতে পারেন না তিনি। যারা ব্যাংক থেকে অকাতরে ঋণ নিতে পারে। ঋণ যাতে শোধ করতে না হয়, তার জন্য আকাশ-পাতাল তোলপাড় করতে পারে, তারা আল্লার ফজলে সব পারে।

এসব কথা আব্বা আম্মাকে বলেন, বলেন সবটা আম্মার জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য নয়, বরং সোফিয়াকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করার জন্য। সোফিয়ার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে নিজেই বেরিয়ে পড়ে পাত্র সন্ধানে। কিন্তু কিভাবে কোথায় কার কাছে যেতে হবে বুঝতে পারে না। আর পাত্র কি গরু নাকি যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে?

সোফিয়ার ঘরের ভিতর মোবাইল ফোন বাজল। সোফিয়া চেয়ার ছেড়ে নিজের ঘরে আসে। বিছানার ওপর থেকে মোবাইল ওঠায়, হ্যালো।

-হ্যা বলছি, কে, লিলি? কি খবর?... বিকালে? না, আজ বিকেলে, দাঁড়া একটু মনে করে নিই, না, বোধ হয় কোথাও যাবো না, কেন বল তো?... আচ্ছা, ভেরি গুড, বাহ্। ... কি বললি, এগ্রিকালচার ফার্ম আছে? ও, ডেইরি ফার্ম? তার মানে দুধ বেচে?... বলিস কি? দুধ বেচে কেউ এত টাকা... শেরাটনের লাউঞ্জে, বিকাল পাঁচটা?

একটু ভাবল সোফিয়া।

পরে নিরাসক্ত গলায় বলল, যেতে পারি একটা শর্তে। আমাকে দেখে তুই চিনবি না, আমি অই দিক দিয়ে হেঁটে তোদের দেখে দেখে চলে যাবো। তোদের সঙ্গে আমি জয়েন করবো না। চলবে?

অন্যপ্রান্ত থেকে লিলি বলল, চলবে, চলবে, খুব চলবে। তুই শুধু দেখে বলবি ছেলেটা কেমন? মার বেশি মত নেই, বড় লোক না তো, তাই। আসিস, কেমন?

ব্যাপারটা রওশনের বিশ্বাস হয় না। বনেদি খানদানি অবস্থাপন্ন মানুষ। একমাত্র ছেলে তাদের। সুশিক্ষিত, সুদর্শন, মার্জিত। অথচ সমস্ত ঢাকা শহরকে চিরুনি অপারেশনে প্রায় কাহিল করে ফেলেছেন। কিন্তু মনের মতো একটা মেয়ে পেলেন না। একেই বলে কপাল। এটা একটা কথা হলো? ঢাকা শহর ভর্তি মেয়ে। এত এত হাইরাইজ, এত এত শপিং মল। হোটেল রেস্তোরাঁ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সবখানে বিবাহযোগ্যা মেয়ে গিজগিজ করে। আর তার একমাত্র সুদর্শন, সুশিক্ষিত ছেলের জন্য, মনের মতো একটা মেয়ে পাচ্ছেন না। এই 'মনের মতো' শর্তটির জন্যই আরো নাজুক হয়ে যাচ্ছে অবস্থা। মনের মতো বলতে রওশন এবং কামাল সাহেব উভয়েই স্বপ্ন দিয়ে তৈরি একটা মেয়ের ছায়ামূর্তি নির্মাণ করেছেন যার উচ্চতা হবে পাঁচফুট চার, বর্ণ হবে গৌর, এমএ পাস হবে ইংরেজি কি অর্থনীতিতে, বাবার অবস্থা খুব ভাল হতে হবে। তাকে চোর জাতীয় কিছু হলে চলবে না, তাকে ভদ্র-নম্র, সুশীলা হতে হবে এবং সর্বোপরি রন্ধনকার্যে নিপুণা হতে হবে। রওশন ও কামাল উভয়ে এখনো মনে করেন, তাদের মতো পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য পাত্রী হিসেবে এটা এমন কিছু বড়চাওয়া নয়। কিন্তু এখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে এই মেয়ে দেখার ব্যাপারে এমন চটকিয়ে রেখেছেন যে, এ বিষয়ে কেউ আর কোন কথা শুনতে চায় না।

রওশন এতে কিন্তু খুব একটা বিচলিত নন। তিনি বরং হেসেই ভেঙ্গে পড়েন। এটা একটা কথা হলো, একটা মেয়ে পাব না! এখন আমি নিজে মাঠে নামব। আমি দেখে নেবো। আমার নামও রওশন, আমি বাপের মেয়ে।

কামাল জানেন না, বলেন, দুই-একটা শর্ত কেটে ছেঁটে একটু ছোট করলে হয়।

- কি রকম?

- অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত মেয়ে রান্নাঘরে যায় না।

-কেন, আমি যাই না?

কামাল সাহেব বেশি দূর এগোতে চান না, বলেন, হ্যাঁ, তাইতো!

এটা যদি বলেন, ম্যাট্রিক ফেলকে শিক্ষিতের কাতারে আজকাল ধরা যায় না, তাহলে মিনিমাম এক সপ্তাহ বাসায় ফোঁস-ফাঁস, থাল-প্লেট ভাগাভাঙ্গি ও কান্নাকাটি (বিলাপসহ) চলবে। তার চেয়ে নিরাপদ অবস্থানে থাকাই শান্তিময় হবে।

রওশনের টেলিফোন করতে ইচ্ছা করল। কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য বলা চলে একটা তৃষ্ণার মতো চাপ বোধ করলেন তিনি। টেলিফোনের বইয়ের তিনি পাতা ওলটাতে লাগলেন। রাজিয়ার সঙ্গে বিয়ের পর বহুদিন কোন যোগাযোগ রাখেননি তিনি। না রাখার নিগূঢ় কারণ ছিল। কামাল সাহেব মিনহাজ সাহেবের নাম পর্যন্ত শুনতে চান না, বলেন, ও একটা ঠগ, প্রতারক! অথচ বিয়ের আগে কামাল-মিনহাজ বন্ধু দিলেন, রওশন-রাজিয়া সই ছিলেন।

রওশন বলেন, আল্লার ইচ্ছা না থাকলে বিয়ে হয়?

-তা হয় না, কিন্তু অই বেটা আমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছিল, –বেটা বদমাস

–রওশন তখন পোজ্ নেন, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারেন।

-কেন, আমি কি খারাপ? রাজিয়ার চেয়ে কোন্‌দিক দিয়ে আমি নিসপি বলো?

নিসপি শব্দটা একেবারে গ্রাম থেকে তুলে আনা। কামাল সাহেব জানেন, এরপর আর কথা বললে বিপদ আছে। তিনি চট করে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দেন, নিস্‌পি মানে! তার সঙ্গে তোমার মানে তোমার সঙ্গে তার তুলনা হয়! কোথায় ইসে আর কোথায় ইসে, ধানে আর তুষে।

অথচ কামাল আর মিনহাজ একসঙ্গে পড়তেন। একসঙ্গে পড়তেন রাজিয়া আর রওশনও।

রওশন ডায়েল করেন, হ্যালো, কে, রাজিয়া? কেমন আছিস, ভাল আছিস? কাজকর্ম নেই তো, ভাবলাম তোকে একটু ফোন করি, তা কেমন আছিস?

রাজিয়া মিনহাজের দিকে তাকান, বলেন, ভাল। তুই?

-তোর লোকটা আছে ধারে কাছে?

-কে, আমার হাজব্যান্ডের কথা বলছিস তো? আছেন, ধারে কাছে নয়, ঘাড়ের ওপর, তোর কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে আছে। কথা বলবি?

রওশন বলল, যাহ্, ফাজিল। শোন্, ছেলের জন্য একটা মেয়ে পাওয়া গেছে। আমরা আর পারলাম না তো! শেষ পর্যন্ত ছেলেকেই লাগিয়ে দিলাম। ওর এক বন্ধু আছে না? কাকাতুয়া?

রাজিয়া বিরক্তি প্রকাশ করার একটা ছুঁতো পেলেন, কাকাতুয়া তো পাখির নাম ।

-আজকালকার পোলাপান কী শয়তান জানিস! ওর বন্ধুর নাম হলো ফরিদ। ফরিদ থেকে প্যারোটা। প্যারোট।

রাজিয়া বলেন, প্যারোট না প্যারট। প্যারট মানে তোতা পাখি, কাকাতুয়া নয়।

রওশন হাসেন, অই হলো। আজকালকার পোলাপান এত জানে নাকি? আমাদের সময়ে আমরা ক্লাস সেভেনে যা শিখেছি এখন ইকোমিক্সে এমএ পাস করেও–

-ইকোমিক্স না, ইকোনোমিক্স। তোর লোকটা আশেপাশে আছে?

-আছে।

-আমার সঙ্গে কথা বলছিস জানে?

-বোধ হয় টের পেয়েছে।

-হাসছে? নাকি–

রওশন বলে, হাসবে! পারলে মারতে আসে! শোন্, কাকাতুয়া খুব চটপটে ছেলে তো। এমন একটা পালিশ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে না? মেয়ের বাবার জাহাজ আছে সতেরোটা, কার্গো জাহাজ আছে, লন্ডন যায়। মেয়ে ইকোনমিক্সে এমএ পাস। ঢাকা ভার্সিটি। সুন্দর। পাঁচ ফুট পাঁচ। রান্না জানে। ছেলেতে মেয়েতে আজকেই দেখা হবে। আমার মনে হয় এবার হয়ে যাবে। শোন্। তোর মেয়েকে রান্নাটা শিখিয়ে রাখ। কাজে দেবে। এর মধ্যে আর কোন প্রস্তাব এসেছে?

রওশনের কথার টানটা অসহ্য! রাজিয়া ফোন রেখে দিলেন।

মিনহাজ বললেন, লাইন কেটে গেল?

-হ্যাঁ।

একটু পর বললেন, লাইনের দোষ নেই। ওর কথা বলার ঢঙ লাইনের সহ্য হয়নি। শোন, একটা কথা বলি।

বলে রাজিয়া চুপ করে গেলেন। মিনহাজ তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করেন।

-বলো।

-ওকে লাগিয়ে দাও। ও-ই ছেলে খুঁজে বের করুক।

মিনহাজ সাহেব খবরের কাগজের খেলার পাতায় ডুব দিলেন। রাজিয়ার শেষ কথাটা তার কানে ঢোকেনি। ক্রিকেটের পর হকিতে বেধড়ক মার খাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মতো টীম পেয়ে পৃথিবীর সব দেশ খুব খুশি। এমন সহজে রেকর্ড-মার মারা যায়! কিল ওচাতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে! এত নাবালক অবস্থায় এদের বাইরে বের হওয়া কি উচিত হচ্ছে?

রাজিয়া খবরের কাগজ ধরে টান দিলেন।

মিনহাজ অবাক হন, বলেন, কি হলো?

রাজিয়া ঘুষি পাকান, আমার কথা শোন না কেন?

-আহা, কি মুশকিল! তোমার কোন কথাটা কবে আমি শুনিনি, বলো। শোন, অনন্ত কালকে ফোন করেছিল।

-কি বলল? টাকা চাই?

-না, ও চলে আসতে চায়। বলল, মুসলমানরা আমেরিকার ডিক্লেয়ার্ড এনিমি হয়ে গেছে। আমি বলে দিয়েছি, যা সে ভাল মনে করে, করতে পারে।

আবার তিনি পত্রিকায় ডুব দিলেন।

লিলি ইচ্ছা করেই একটু দেরি করে এলো। ঢাকায় এখন এই দুই হাজার তিন সনেই ট্রাফিক জ্যামের যে অবস্থা, এমন হারে এর প্রবৃদ্ধি হলে দুই হাজার পঞ্চাশ সনে একে আর দেখতে হবে না। তার কাজটা যে জবর একটা বিবেচনার কাজ হয়েছে তা শেরাটনের লাউঞ্জে ঢুকেই সে বুঝল। কথা ছিল, রিসেপশনের সামনে দাঁড়িয়ে

থাকবে, লাল হাফ শার্ট পরে। লাল হাফ শার্ট নেই। কথা ছিল, লিলি নীল শাড়ি পরে আসবে। এখানে লিলি একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। সে ভেবে দেখেছে, যদি লাল শার্টের চেহারা তার ভাল না লাগে, তাহলে সে ধরাই দেবে না। তাই সে গরদ রঙের একটা সিল্ক পরে এসেছে। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। এখন সে মেয়ে মানুষ, একা একা কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে কতগুলো অবাঞ্ছিত দৃষ্টির খোঁচায় বিদ্ধ হবে নাকি? এর চেয়ে একটু সামনে গিয়ে একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করা বরং সহনীয় হবে।

একটু সামনে যেতেই সে দেখল, একটা সোফায় লাল হাফ শার্ট পরা একজন বসে আছে। লিলির খটকা লাগল। সে ওখানে একটুখানি দাঁড়াল, তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। চেহারাটা কিন্তু বেশ। সে একটু দাঁড়াল, কিন্তু ভদ্রলোক তাকে পাত্তা দিল না।

লিলি সাবলীল ভঙ্গিতে বলল, আমি এখানে বসতে পারি?

-পারেন। বসুন না, আমি না হয়, অই সামনের চেয়ারটায় গিয়ে বসব।

লিলি ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, আপনি বসুন। আমি বসলে কি আপনার অসুবিধা হবে?

এক

-হ্যাঁ।

-আপনি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন বোধ হয়?

-ঠিক ধরেছেন।

লিলি চান্স নেয়, মহিলা? নীল শাড়ি পরে আসার কথা ছিল?

কায়সার ঘেমে গেল, হঠাৎ ঘরের এয়ারকন্ডিশন যন্ত্রের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মনে হয় কমে গেল। অবাক চোখে সে লিলির দিকে তাকিয়ে রইল। লিলির হাসি পেল, সে বসে পড়ল, বলল, বসুন না। ইসে আপনার নামটা জানতে পারি?

-নাম দিয়ে কি করবেন?

-মনে রাখব। একটা মানুষকে মনে রাখতে হলে নামের প্রয়োজন হয়। হয় না?

-তা হয়।

ভদ্রলোক একজন অচেনা মহিলার সঙ্গে বেশি কথা বলতে আগ্রহী নন। ওরা চুপ করে বসে রইল। সে ঘড়ি দেখল। উসখুস করল। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে একটা হাত কপালে চেপে ধরল।

লিলি বলল, আমার নাম লিলি। লিলি হক।

এই প্রথম কায়সার লিলির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, আপনার কি নীল শাড়ি পরে আসার কথা ছিল?

-হ্যাঁ। এবার আপনার নাম বলুন।

-কায়সার। কিন্তু কথা রাখলেন না কেন?

প্রশ্নটায় ধমক মেশানো। মেজাজ মেশানো?

সে আবার বলল, দেখুন তো, আপনাকে আমি অন্য লোক মনে করে, ইগনোর করছিলাম।

লিলি এবার ধমক দেয়, আপনার রিসেপশন কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল না!

-পাঁচটার সময়, ইয়েস। পাঁচটা বিশ পর্যন্ত তা-ই ছিলাম। বিশ মিনিট পর আমার এখানে থাকারই কথাছিল না– কিন্তু ভাবলাম, ট্র্যাফিক জ্যাম-এ পড়েছেন হয়তো। তাই কি?

লিলি বলল, এখানে সফট ড্রিঙ্ক সার্ভ করবে?

-কি খাবেন বলুন।

- আপনি বলুন।

- ফ্রেশ লেমন?

-ওকে।

কায়সার উঠতে যাবে, তখনই ওদিক দিয়ে পাস করছিল সোফিয়া। কথা ছিল, ওরা কেউ কাউকে চিনবে না। কিন্তু লিলির আজ সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। সে ডাকল, সোফি না?

সোফিয়া তাল দেয়, আরে লিলি তুই?

লিলি বলে, আয় পরিচয় করিয়ে দিই।

আয়, বোস।

সোফিয়া লিলির পাশে বসল। একবার চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে, লোকটা বেশ বিস্মিত চোখে তাকে দেখছিল। সোফিয়া চোখ নামিয়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে।

লিলি বলল, ইনি কায়সার হোসেন। এককালে জমিদার ছিলেন। এখনো শত শত বিঘা জমি আছে, জাহাজ আছে সতেরোটা–

-মিথ্যা কথা! কে বলেছে? মিথ্যা কথা। ডাহা মিথ্যা কথা!

লিলি আকাশ থেকে পড়ে, মিথ্যা কথা!

-অফ কোর্স মিথ্যা কথা!

-আপনার কার্গো জাহাজ লন্ডন যায় না?

-মোটেই না। আমরা কোনদিন জমিদার ছিলাম না। এসব কথা আপনি কোথায় পেলেন? এরকম ডাকাতিয়া মিথ্যা কথা!

-কেন, আপনাদের ডেইরি ফার্ম নেই?

কায়সার হেসে উঠে, বলে, ডেইরি ফার্ম! অর্থাৎ দুধের কারখানা? কী যে বলেন! দেশের বাড়িতে একটা দুটো গাই থাকাকে যদি ডেইরি ফার্ম বলেন, তাহলে হয়তো আছে।

লিলি উঠে দাঁড়ায়। চাপা ক্রোধে মুখ লাল হয় তার, বলে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন!

কায়সার দেখল, সামনের টেবিলটা কাচের। ওখানে ঘুসি মারলে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। সে সোফার হাতলে জোরে কিল বসাল। বলল, আমি নই, মিথ্যা কথা আপনি বলছেন!

দেখাল সে খুব রেগে গেছে।

সোফিয়ার বেশ মজা পাচ্ছিল। বিশেষ করে ভদ্রলোকের হাবভাব রীতিমতো দেখবার মতো। তার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক প্রাণপণে অভিনয় করছেন। কিন্তু সোফায় যে কিলটা উনি বসালেন, ওটা অভিনয় প্রসূত না। বাম হাত দিয়ে তিনি আবার ডান হাতটা এখন ঘষছেন।

সোফিয়া বলল, নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে। উনি জমিদার, এই সংবাদ তুই কোথায় পেলি?

–কেন, ফরিদ সাব বলেছেন। বলেছেন, ঢাকায় উয়ারিতে যে বাড়িটায় ইনারা থাকেন, সেটা দেড় বিঘা জমির ওপর। প্রচুর গাছপালা। কায়সার বলল, বুঝেছি! কাকাতুয়া! বেটা কাকাতুয়ার কাণ্ড!

লিলি ও সোফিয়া একসঙ্গে বলে উঠে।

–অই ফরিদ! আসলে কি জানেন, ফরিদ আসলে ঠিকই বলেছে। উয়ারিতে আমরা যে বাড়িটায় থাকি। সেখানে দেড় বিঘা জমি আছে। প্রচুর গাছপালাও আছে। কিন্তু বাড়িটা আমাদের না।... আমার বাবা অই বাড়ির দারোয়ান।

–কি বললেন! দারোয়ান!

–হ্যাঁ।

সমস্ত পৃথিবীকে তাচ্ছিল্য করে বুক ফুলিয়ে টান টান হয়ে বসে ওদের দু'জনের মাঝখানে দু'চোখ স্থির করে ধরে রাখল কায়সার। কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, দারোয়ান, কিন্তু কি জানেন? হি ইজ এ গুডম্যান। অন্যান্য বাবাদের মতো পৃথিবীর কাছে লজ্জিত হওয়ার মতো কিছুই নেই তার। লুকানোরও কিছু নেই। জাস্ট এ ক্লীন স্ট্রেইট গুডম্যান। ইফ ইয়্যু নো হোয়াট আই মীন।

লিলির এই ঔদ্ধত্য একটুও সহ্য হচ্ছিল না। সে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলল, মানলাম, তিনি গুডম্যান। তাহলে আপনার লেখাপড়ার খরচ তিনি–

–তিনি দেননি।

–কে দিয়েছে তাহলে?

–স্কলারশিপ। টিউশানি। ... আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

প্রশ্নটা সে করল মুখ টিপে হাসতে থাকা সোফিয়াকে উদ্দেশ্য করে।

সোফিয়া প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি এখানে এলেন কেন?

এবার হাসল কায়সার।

বলল, কাকাতুয়া আমাকে বলল, মেয়েটা বাপ-মার একমাত্র মেয়ে। সতেরোটা জাহাজ আছে, কার্গো জাহাজ আছে, লন্ডন যায়, গার্মেন্টস আছে, বাইং হাউস আছে, শপিং মল আছে। একটা ভাল ছেলে চাচ্ছে সে। আর কিছু নয়। তো ভাবলাম–

–কাকাতুয়া? কাকাতুয়া বলেছে?

সোফিয়ার বিস্ময় প্রশ্নটাকে ডুবিয়ে দিল।

–অই ফরিদ আর কি! শূয়র। ওকে আমরা কাকাতুয়া বলি।

লিলি প্রশ্ন করে, কি ভাবলেন?

–ভাবলাম, ভাল কাপড়-চোপড় পরে গেলে হয়তো আমাকে দেখেই একেবারে মজে যাবে, তখন হয়তো বাপ-মার কথা আর জিজ্ঞেস করবে না। তখন আমি তাকে সোজা বলে ফেলব, দেখুন, আমার একটা চাকরির দরকার, দিন না কোথাও একটা কিছুতে ঢুকিয়ে। কিন্তু–

কায়সার উঠে দাঁড়ায়, চলে যেতে উদ্যত হয়।

লিলি প্রশ্ন করে, কিন্তু কি?

–আপনি আমাকে দেখেই এমন রেগে গেছেন, রেগে আছেন। কপাল। চলি। আমার একটা লাভ হয়েছে। এতো বড় লোকের কোন মেয়েকে এর আগে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আজকে হলো থ্যাঙ্ক ইয়্যু।

কায়সার ধীরলয়ে চলে গেল।

লিলি সোফায় হেলান দিল। আস্ফুটস্বরে বলল, বাস্টার্ড! হিন্দী সিনেমা দেখে দেখে এমন হয়েছে না দেশটা, অসহ্য!

সোফিয়া মনে মনে বলল, লোকটা ভাল। তাতে সন্দেহ নেই। আর চেহারাটি? দারুণ।

সে হাসতে হাসতে বলল, কাকাতুয়া! তুই দেখেছিস কাকাতুয়াকে?

–বড্ড বেশি কথা বলে। বলেছে, ওদের দেশের বাড়িতে বিরাট এলাকা নিয়ে দালানবাড়ি আছে। চারদিকে দেড়মানুষ উঁচু দেয়াল, ভিতরে পুকুর, খেলার মাঠ হি-হি-হি।

হাসি থামতে চায় না লিলির। একসময় জোর করে থামাল। হাঁফাল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, দারোয়ানের ছেলে! হুঁ!

কাকাতুয়াকে দেখে অবাক হন রওশন। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন, তুমি! তুমি ওখানে যাওনি?

কাকাতুয়া ভিতরে ঢুকে যায়, বলে, কী যে বলেন খালাম্মা, আমি কেন যাবো? ছেলেতে-মেয়েতে কথা হবে, গান হবে, নাচ হবে, খানাপিনা হবে, ওখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান কোথায়? আপনি একটুও চিন্তা করবেন না খালাম্মা, বাবার সতেরোটা জাহাজ আছে, কার্গো জাহাজ যায় লন্ডনে, গার্মেন্টস আছে, কিন্তু মেয়েটা একদম সরল। আমাকে বলল, আমার শাশুড়ি যদি চান তাহলে আমি রান্নার কোর্স বিয়ের আগেই শেষ করে ফেলব। কী রকম সরল দেখেছেন? আমি বলেছি, আপনারা সহজ-সরল মানুষ। বাসায় একটা কাজের লোক পর্যন্ত রাখেন না। তো লিলি বলল, কাজের লোকের কি দরকার? আমিই তো আছি। আমি সব কাজ করব, রান্নাবান্না হাঁড়ি-পাতিল মাজা, কাপড় ধোয়া–

এক ফাঁক দিয়ে কোনমতে ঢুকলেন রওশন, বাবা, একটা কথা বলো দিকি শুদ্ধ করে, কথাগুলো তুমি কি মুখস্থ করে এসেছো?

হকচকিয়ে যায় ফরিদ, হাসতে চেষ্টা করে, বলে, কী যে বলেন খালাম্মা!

–মেয়ের বাবার ব্যাঙ্কে লোন কত আছে?

মুখ মুছে ফরিদ বলে, লোন নেই খালু। এক পয়সাও লোন নেই। আপনার মত ক্লীন মানুষ।

কামাল সাহেব কথাটাকে উড়িয়ে দেন, যাঃ, তা-ও কি হয়? বাংলাদেশে লোন ছাড়া বড়লোক হয়? তুমি জানো না।

তুমি চাকরি-বাকরির আর চেষ্টা করো না। এই ঘটকালির পেশায় লেগে থাকো। ভাল করবে। শাইন করবে।

দাঁত বের করে হাসে ফরিদ।

–কি খাবে বলো তো!

–দেন যা আছে খালাম্মা। আমি তো আপনার ছেলের মতোই। কায়সারের সঙ্গে পড়েছি, কায়সার আমার জন্য, মানে আমার জন্য কায়সারের ফিলিং আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরও ফরিদ চলে গেল না। বরং গ্যাট হয়ে বসল। কামাল সাহেব অগত্যা প্রশ্ন করলেন, তুমি কি কিছু বলবে?

ফরিদ বলল, সেটাই তো ভাবছি খালুজান। কথাটা যে আপনাকে কি করে বলি। কথাটা হলো, যে মেয়েটাকে কায়সার আজকে দেখতে গেল, সেই মেয়েটা সম্বন্ধে।

রওশন প্রশ্ন করেন, মেয়েটা সম্বন্ধে কি?

ফরিদ বলল, ঠিক মেয়েটা সম্বন্ধে নয় খালাম্মা।

মেয়েটার বাবা–

–কি হয়েছে ওর বাবার?

–তার কোন জাহাজ নেই। কার্গো জাহাজ নেই। গার্মেন্টস নেই। শপিং মল নেই।

কামাল সাহেবের বিরক্তি চরমে। তিনি ধমকে উঠলেন, তার মানে!

–আমি ভুল খবর পেয়েছিলাম। উনি এমনিতে খুব বড়লোক। কিন্তু তার যে কি ব্যবসা তা কেউ জানে না।

–কি বরছো তুমি?!

–তবে রাজনীতির বড় বড় লোকজন তাকে খুব মানে।

কামাল সাহেবের চোখ বিস্ফারিত হলো। তিনি কোন কথা বলতে পারছেন না।

দায়িত্ব পালনের মতো করে ফরিদ তার কথা একটানা বলে যেতে থাকে, এখন মেয়েটাকে যদি কায়সারের পছন্দ না হয়, আর মেয়েটার ওকে পছন্দ হয়, তাহলে বিয়ে করতে হবে, করতে হবেই। কায়সারের সব ভালমন্দ এখন এই মেয়ের হাতে। আমি বলছি কি, পছন্দ হোক বা না হোক, এ বিষয়ে কায়সার বা আপনারা কোন কথা বলবেন না। পছন্দ না হলেও তা বলা যাবে না। আর মেয়ের যদি পছন্দ হয়, তাহলে বিয়ে করাতে হবে।

... মানে ওর বাবা,

ফজলুল হককে যাদের চেনা দরকার তারা খুব ভাল করে চেনে।

রওশন বলল, কাজটা তুমি ভাল করোনি মিয়া।

–বিশ্বাস করেন খালাম্মা–

কামাল সাহেব ওকে থামিয়ে দেন, যাও, তুমি যাও বাবা। যাও। যা-আ-ও বলছি!

ফরিদ মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে। তারপর ফিরে তাকায়। এগিয়ে আসে, বলে, খালু, আমার পকেটে একটা পয়সাও নেই খালু। আমি এখন টঙ্গি যাবো কি করে?

কামাল সাহেব রওশনের দিকে তাকালেন। রওশন পার্স এনে খুললেন।

কাকাতুয়ার বিদেয় হওয়ার মিনিট পাঁচেক পরে গুণগুণ করে গান করতে করতে পিছনের উঠানের গেট দিয়ে ঢুকল কায়সার। ঢুকেই দেখল, বারান্দায় বাবা ও মা দাঁড়িয়ে আছেন।

ওদের অগ্রাহ্য করে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল কায়সার, ভিতরে ঢুকতে যাবে, তখনই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কানে কানে তাকে কিছু বলল বুঝি। সে অমনি তাকাল দু'জনের দিকে। গম্ভীর নয়, থমথমে চেহারা।

সে হকচকিয়ে যায়, বলে, কি হয়েছে মা?

রওশন বলল, মেয়ে দেখেছিস?

–হ্যাঁ। দেখেছি, কথা বলেছি।

–পছন্দ হয়েছে?

–পছন্দ! এমন থার্ড ক্লাস মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। এই কাকাতুয়াকে আমি টাইট দেবো! বেটা–

চোপ!

গর্জে উঠলেন কামাল সাহেব।

–চুপ মানে, কি ব্যাপার? তোমরা এমন করছ কেন?

কামাল সাহেব বললেন, পছন্দের ব্যাপারে কোন কথা কারো সামনে উচ্চারণ করবি না। মেয়েরা কি রাস্তার মাল নাকি যে, দেখবি আর বলবি পছন্দ হয়নি! খবরদার!

–কাকাতুয়াকে কিছু বলব না?

–না। যাও, নিজের করে যাও। আর এখন থেকে কখন কোথায় যাও, কি করো সব আমার কাছে রিপোর্ট করবে।

কিন্তু বাবা

–ব্যস্, আর একটি কথাও নয়।

কায়সার এই কথা ভাবতে ভাবতে গুনগুন করছিল যে, আজকের অভিজ্ঞতার কথা সে রসিয়ে রসিয়ে মাকে বলবে, আর একটু দূরে বসে বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে তা শুনবে আর মনে মনে হাসবে– কিসে যে কি হয়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল কায়সারের। বাবাকে সে দারোয়ান বানিয়েছে। যদি কোন দিন কোনভাবে সেই কথা কামাল সাহেবের কানে যায়, তা হলে কি হবে?

নিজের ঘরে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে কায়সার অনুভব করল, তার খিদে পেয়েছে। অতপর তার মনে হলো, দারুন একটা দিন কেটেছে তার। তারপর মনে হলো। দিনটা বড় ভাল দিন ছিল, বড় সফল ছিল আজকের সূর্য ওঠা, শরৎ মেঘের আসা-যাওয়া এবং একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য আরেকজনের কাছে যাওয়ার কষ্ট তার গায়ে লাগেনি।

সোফিয়া। সোফিয়া সম্বন্ধে আমি আরো জানতে চাই।

টেবিলের ওপর মোবাইল বাজল।

সে ধরল, হ্যালো। ... আহ্ কাকাতুয়া, তোকে আমার ভীষণ দরকার।

কাকাতুয়া তার কথা বলার জন্য ব্যাকুল হলো, বলল, শোন্, লিলির সঙ্গে আর যেন তোর দেখা না হয়। খুব সাবধান। কথাটা হলো কি–

কায়সার বলল, শোন্ আমি ওকে বলেছি, আমার বাবা দারোয়ান আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের চেহারা পাল্টে গেল।

কাকাতুয়া হে-হে করে হাসতে লাগল, বলল, ওদের মানে কি? শোন্, আমি কালকে আসব।

ফোনের বিল উঠছে।

ও ছেড়ে দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কায়সার।

প্রতিজ্ঞা করল, এভাবে গুরুজনদের নিয়ে আর কোন মিথ্যার আশ্রয় নেবে না।

লিফট থেকে নয়তলায় নেমে ব্যাংকের ভিতর ঢুকে সোফিয়া হকচকিয়ে গেল। চৌদ্দ-পনের জন স্যুট-টাই পরা লোক পুতুলের মতো বসে আছে। পোস্ট তো মাত্র তিনটা। তো এতো লোক ডাকল কেন? এতো লোককে লিখিত পরীক্ষায় পাশই বা করানো হলো কেন? একপাশে তিনটা চেয়ারে তিনজন মেয়ে বসে আছে। ওখানে খালি চেয়ার একটা আছে।

তার মানে খালি চেয়ারটা তার জন্য। মেয়ে প্রার্থী তাহলে চারজন হলো। বব-কাটা উগ্র সাজের মেয়েটি তার দিকে কেমন করে যেন তাকাল।

বসে সোফিয়া ঘড়ি দেখল। তারপর ভাবল, এখানে তার চাকরি হবে না। এভাবে নিজেকে এতো ছোট করে তার চাকরি পাওয়ার প্রয়োজনও নেই। চলে যাবে? না, ইনটারভিউ না দিয়ে যাব না। কিছু নতুন লোককে দেখা যাবে। কেমন করে ইনটারভিউ হয়। বোঝা যাবে। তখন ব্যাগের ভিতর মোবাইলটা বাজতে শুরু করল। যাঃ, ওটা আনা বোধ হয় ঠিক হয়নি। সে ব্যাগ খুলে মোবাইল টিপে নম্বর দেখল, তারপর ফোন বন্ধ করে দিল। সবগুলো লোক তার দিকে তাকিয়ে রইল। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আসে মোবাইল ফোন নিয়ে এ কেমন লোক!

আর তখনই সোফিয়া সবিস্ময়ে দেখল। বেগুনী রঙের হাফশার্ট পরা একজন ঢুকছে। সবার স্যুট আছে, ওরই কেবল নেই।

কায়সার। গতকালকার অদ্ভুত অহঙ্কারে আচ্ছন্ন সেই লোকটা। সোফিয়া দেখল, কায়সার ঘরে ঢুকে হাল্কা চোখে চারদিকে একবার চোখ বুলাল। তারপর নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে এক কোণে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বসার মতো কোন চেয়ার খালি নেই বলে তার একটু সুবিধেই হলো মনে হলো। প্যান্টের পকেট থেকে ছোট একটা বই বের করে কায়সার এক পায়ের ওপর আরেক পা রেখে পড়তে শুরু করল।

পকেটে বই নিয়ে ঘোরে, আজিব মাল তো! ঘরের সবগুলো মানুষ একাধিকবার ওর দাঁড়ানোর আর পড়ার ভঙ্গিটি দেখল। মুখ টিপে কেউ হাসল বা।

সাদা উর্দি-পরা একজন পিয়ন মতো লোক কাঠের হাতলবিহীন একটা চেয়ার ওর সামনে এনে রাখল। বলল, বসেন, স্যার।

ও একবার চেয়ারটার দিকে তাকাল, তারপর বইয়ের পাতা ওলটাতে গিয়ে মুখ তুলে তাকাতেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সোফিয়ার ওপর। এক পলক। তারপর তার চোখে-মুখে মৃদু বিস্ময় ফুটে উঠল। ও বইটা তখন সে পকেটে ভরল। তারপর দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো।

কয়েক সেকেন্ড সোফিয়া বসে থেকে পরে উঠল।

লিফটের সামনে এসে দেখল, কায়সার দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে সোফিয়াকে সে দেখল তারপর লিফটের দিকে তাকিয়ে রইল।

–চলে এলেন যে! ইনটারভিউ দেবেন না?

–না।

–কেন?

–আমার কোন আশা নেই।

সোফিয়া কায়সারের চেহারার ভঙ্গিটি বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল। তারপর বলল, কি করে বুঝলে?

–কিসের কথা বলছেন?

–এই যে আপনার কোন আশা নেই?

–অ!

ফিসফিস করে কায়সার বলল, টাকা চেয়েছিল। তিন লাখ। দিইনি।

বলে কায়সার হাসির চেষ্টা করল।

দুই

লিফট এসে থামল। ওরা দাঁড়িয়ে রইল। ওঠার কোন চেষ্টা করল না।

সোফিয়া বলল, মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি তিনটা নাম পাঠিয়েছিল। মন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে। এমডি সাব অই কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি নাকি ফোনে ধমক দিয়েছে, তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ নাকি যেন করে দেবে। এমডি বলেছে, স্ট্যান্ড রিলিজ কে কাকে করে দেখা যাবে।

কায়সার সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ। মেয়েটার যেচে তার কাছে না এলে তার সঙ্গে আর কোনদিন কোন কথা হতো না। হালকা বাতাসের মতো বড় সহজ ভঙ্গিতে সে এসেছে। কথা বলছে, কথা বলছে বহুদিনকার পরিচিতের মতো। এর জন্য কায়সারের বুকের ভিতরে একটু কষ্ট হলো। এখন যদি সে চলে যায় আর কোন কথা না বলে তাহলে এই কষ্ট বাড়বে। হালকা বাতাসটা প্রচণ্ড এক ঝড় হয়ে তাকে লণ্ডভণ্ড করবে।

–আপনি এতো কথা জানলেন কেমন করে?

–ওরা বলাবলি করছিল।

ওরা দাঁড়িয়ে রইল। লিফট আসছে, যাচ্ছে। ফ্লোর নির্দেশক ডিজিটাল নম্বর দ্রুত পালটাচ্ছে। লিফটের ওঠা-নামার মৃদু শব্দটা ক্রমে সাহসী হচ্ছে।

কায়সার বলল, আপনি যান। আমি যাবো না।

–কেন, আপনার চাকরির দরকার নেই?

–আমার হবে না।

–হবে।

–হবে না।

–হতে পারে তো!

–ম্যাজিক?

সোফিয়া একটু সময় নেয়। তারপর বলে, আমার ইনটারভিউর সময় আমি বলব, আমার চাকরির দরকার নেই।, চাকরিটা যেন আপনাকে দেওয়া হয়।

কায়সার মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বলে, আমি জানতাম।

–কি জানতেন?

–আপনার চাকরির দরকার নেই।

সোফিয়া রাগ করে বলে, দরকার নেই তো, ইনটারভিউ দিতে আসলাম কেন?

কায়সার নিজের কথাটাই বলে ফেলে, এসেছেন, শখ করে। বিলাস।

একটু পর বলে, বিলাস না তো কি? যদি বলেন, বসে বসে সময় কাটে না, তাহলে আপনার বাবার সতেরোটা না হোক ষোলটা জাহাজ তো আছেই। গোটা চারেক কার্গো জাহাজ তো হবেই। ওদের নিশ্চয়ই একটা অফিস আছে। ওখানে একটা ডাকসাইটে পোস্ট বানিয়ে–

সোফিয়া জোরে হেসে ওঠে।

কায়সার শক্ত হয়, বলে, হাসবেন না।

সোফিয়ার হাসি থামে না।

–বলছি, হাসবেন না!

–হাসির কথা বললে হাসবো না?

–হাসির কথা কি বললাম?

সোফিয়ার হাসি এক সময় থামল।

কিছুক্ষণ সোফিয়া ইতস্তত করল। কিছু একটা বলার জন্য চেষ্টা করছে সে, বোঝা গেল। কায়সার তা বুঝল কিন্তু আমল দিল না। অতএব সোফিয়াকে বলতে হলো, আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে।

–চা এখানে কোথায় পাবেন?

–এসব হাইরাইজ কমার্শিয়াল বিলডিংয়ের কোন না কোন ফ্লোরে রোস্তোরাঁ থাকে।

– কিন্তু ইনটাভিউ?

–আমার সিরিয়াল চৌদ্দ। আপনার?

–তেরো।

–ইনটারভিউ এখনো শুরুই হয়নি।

কায়সার বলল, দাঁড়ান আসছি।

অই পিয়ন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ঠিক ওপরের ফ্লোরেই রেস্তোরাঁ আছে। বলে পিয়ন ভদ্রলোক

হাসল। হাসিটা ঠিক বুঝতে পারল না কায়সার।

পিয়ন ভদ্রলোক জানাল, দামি হোটেল।

ফাইভ স্টার।

সোফিয়ার কাছে এসে কায়সার বলল, চলুন।

তখন সোফিয়ার মনে পড়ল, তার ব্যাগের ভিতর পার্স নেই। দু'দিন ধরে পার্সটা খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যে রেখেছে।

কায়সার যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছে, দু'কাপ চায়ের টাকা নিশ্চয়ই ওর কাছে আছে। কিন্তু রেস্তোরাঁয় ঢুকেই তার চক্ষু চড়কগাছ হলো। সর্বোনাশ! এ যে ভীষন হাইফাই। দু'কাপ চায়ের দাম এখানে চারশ' টাকার কম হবে না। লিলির সঙ্গে একবার সোনারগাঁ হোটেলে সে পেঁপের জুস খেয়েছিল। এক গ্লাস দু'শ' টাকা! মাই গড!

সোফিয়া বলে, চলুন ফিরে যাই। ইনটারভিউর ডাক পড়ে যাবে।

ততক্ষণে একটা টেবিলে কায়সার বসে গেছে। সোফিয়াকে আহবান করে বসার জন্য। সোফিয়া দেখল, লাজ-লজ্জার চেয়ে উজ্জত অনেক বড়। সে বলল, আমার কাছে টাকা নেই।

কায়সার বলল, বসুন না।

সোফিয়া বসল।

কায়সার বলল, বসুন, আমি আসছি, এক মিনিট।

কাউন্টারে গিয়ে কায়সার বলল, চায়ের সঙ্গে হালকা কি আছে?

–কাটলেট হবে, চিকেন, আর–

–দু'জনের জন্য চা আর কাটলেট। কতো বিল হবে?

–এইট হান্ড্রেড।

–কিছু যদি মনে না করেন, বিলটা আমি আগাম দেবো। এখন।

–বেশ তো।

কায়সার এসে বসল টেবিলে। বলল, এবার বলুন, তখন যে হাসলেন, এতো হাসির উৎস কি আমি? সোফিয়া বলল, আপনার যে বন্ধুটি আছে, কাকাতুয়া, ও একটা ডিজাস্টার।

ডিজাস্টার মানে?

ভীষণ মিথ্যা কথা বলে। আর যখন বলে এমন করে বলে যে, মনে হয় সব সত্যি। একটুও সন্দেহ হয় না। লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে। একটু থেমে সোফিয়া গলার সুর ও গ্রাম নামিয়ে আনল, বলল, লিলির আব্বার একটা নৌকাও নেই, জাহাজ তো দূরের কথা। কার্গো জাহাজ কি সে সম্বন্ধে লিলির কোন ধারণা নেই। জিনিসটা কী, আপনি জানেন?

বেয়ারা খাবার নিয়ে এলো।

দেখে সোফিয়া কায়সারের দিকে তাকাল। কায়সার তার দিকে তাকাচ্ছে না। সোফিয়ার ভীতি ও বিস্ময় এক অক্ষরের দুটো শব্দে ধরা পড়ল,

এ কি?

চিকেন কাটলেট। পছন্দ করেন না?

সোফিয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়ে, পছন্দের প্রশ্ন হচ্ছে না। কিন্তু–

লিলির বাবা কি করেন, অ সরি, এই কৌতূহলের কোন মানে নেই। এক সময় পাটের ব্যবসা ছিল। জুট মিল ছিল। পাট রপ্তানির করতেন। সারা বিশ্বে তার বাজার ছিল। অনেক টাকা কামিয়েছেন তখন। পাট এক সময় গোল্ডেন ফাইবার ছিল। এখন ছেঁড়া তেনা।

কায়সার কাটলেট মুখে দেয়, খান। প্লীজ। ....এখন উনি কি করেন?

কিছু করেন না। কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। হি ইজ এ্যা রিচ ম্যান। রিয়েল রিচ।

শাদা রং আপনার খুব পছন্দ?

এমন ত্বরিত প্রসঙ্গ– পরিবর্তনে সোফিয়া অবাক হলো।

–কেন বলুন তো!

–গতকাল শাদা শাড়ি পরেছিলেন। আজও।

–এই শাড়িটা শাদা নয়। এগ হোয়াইট।

হোয়াইট তো। সোফিয়ার শুধু চেষ্টা নয়। খিধেও পেয়েছিল।

সে খাবারে মন দেয়।

সোফিয়া খাওয়া বন্ধ রেখে কায়সারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে লিলিকে– আপনার কেমন লাগল?

কায়সার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বিশ্রী প্রশ্ন। গতকাল বাবা তাকে বলছে, সাবধান করেছে। বলেছে। সাবধান, মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে। কি হয়নি। এ বিষয় কোনও কারো কাছে কিছু বলবি না। আর এই মেয়েটার সামনে লিলি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য সে করতেও নারাজ।

নিস্পৃহ কণ্ঠে সে বলল। লিলি ভাল মেয়ে। কৌতুক বোধ করে সোফিয়া, ভাল মেয়ে,

কি করে জানলেন?

কায়সার নির্দ্বিধায় গম্ভীর উচ্চারণে জবাব দেয়, আপনার বন্ধু ভাল না হওয়ার কোন কারণ নেই। মুখের ভিতর কাটলেট ছিল। চিবানো বন্ধ হয়ে গেল। সোফিয়ার বুকে, পেটে সর্ব অঙ্গে প্রবাহ হঠাৎ থমকে গেল। সে তাকিয়ে রইল কায়সারের দিকে। কায়সার সোফিয়ার চায়ের কাপে টি-ব্যাগটি একমনে নেড়েচেড়া দিচ্ছে। তার কাপে দুধ ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, চিনি কয় চামচ?

সোফিয়ার ইচ্ছা করল, কী যে ইচ্ছা করল তার সে ধরতে পারে না। ভিতরে ভিতরে তার কি রাগ হচ্ছে? বিরক্তি? বিতৃষ্ণা? কি হচ্ছে তার ভিতরে?

কায়সার তার দিকে তাকায়। সোফিয়া সহজ সুরে বলে দুই চামচ দিন।

আচ্ছা...

–বলুন।

বাসায় টেলিফোন করে আমি টাকা আনিয়ে নেবো?

নিজের চা ঠিক করছে কায়সার নিবিষ্ট মনে। তারপর চায়ে চুমুক দিল। তারপর তাকাল সোফিয়ার দিকে, ধীরে ধীরে বলল, আমার কাছে সামান্য একটু ঋণে আবদ্ধ থাকতে আপনার কষ্ট হবে জানি। বলছিলাম, ঋণ শোধ

করার উপায় তো আছে। ইচ্ছা করলেই আপনি যখন খুশি শোধ করতে পারবেন।

ওরা নীরবে চা শেষ করল।

কায়সার ঘরি দেখল। বলল, এবার যাওয়া যায়।

–বিলটা?

সোফিয়া আশপাশে তাকায়। বেয়ারা কাছে এসে দাঁড়ায়।

বিল?

কায়সার বলে বিল আমি দিয়ে ফেলেছি।

সে কি! কখন? চলুন।

নিচে এসে ওরা দেখল হল ঘরে কোন লোক নেই। ব্যাপার কি? এতো তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ তো শেষ হওয়ার কথা নয়?

পিয়ন ভদ্রলোক বলল, ওরা সব চলে গেছে। আজকে ইন্টারভিউ হবে না।

–কারণ?

–কবে হবে পরে জানানো হবে।

লিফটের ভিতর ওরা দু'জন।

সোফিয়ার উৎকণ্ঠা দূর হয় না।

বলে, অনেক টাকার বিল ছিল?

–বললাম তো, শোধ করার উপায়

আছে।

–কি উপায়?

–আর একদিন আপনি বিল দেবেন। আরো বড় বিল।

সোফিয়ার মুখে হাসি ফোটে।

বলে ঠিক বলছেন তো?

–পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

নিচে নেমে সোফিয়া ভদ্রতা করে, আপনাকে পৌঁছে দেবো?

–না। পুরনো ঢাকার ব্যাপার। ঢোকাও কঠিন, বের হওয়া আরো।

সোফিয়ার গাড়ি সিঁড়ির কাছ এসে থামল। ড্রাইভার নেমে দরজা খুলে দিল।

সোফিয়া গাড়িতে উঠে বসল। কোনদিকে তাকাল না। হাত নাড়ল না। বলল না। আবার দেখা হবে। তখন কায়সারের আর কিছুই ভাল লাছিল না।

ওর দৃষ্টিতে সম্মোহন ছিল, সমর্থ পুরুষের যাদু-চোখে ধৃষ্টতা থাকে, ঔদ্ধত্য থাকে, থাকে অন্য রকম ক্ষমতার অহঙ্কার। প্রথমে তাকে অতিশয় অভদ্র ও অশ্লীল লাগে। তারপর আস্তে আস্তে দৃষ্টি থেকে চেহারা থেকে অসুন্দর

মিলিয়ে যায়। তার স্থান দখল করে এক অপদার্থের কামনার আমন্ত্রণ, অগাধ অতল তৃষ্ণার সামনে বঞ্চিত পানীয়ের আশ্বাস। সেই দৃষ্টির যাদুর তেজের কাছে লিলি আত্মসমর্পণ করল। তার যৌবনময় দেহ তার গভীর কালো চোখের জল আবেগে-আহলাদে টলমল করে উঠল, লোকটার মুখ তার মুখের কাছে এগিয়ে এলো, ওর ঠোঁট লিলির ঠোঁটের একেবারে কাছে চলে এলো। তারপর লিলি কিছু জানে না। জীবন-মরণ নিশ্চিহ্ন করা এক মাতাল আনন্দের সমুদ্রে সে ডুবে গেল আর উতাল-পাতাল দেহের সর্বস্ব নিংড়িয়ে বিপুল এক শিহরণের ভিতর লিলি নিজেকে আরেকবার হারাল।

ঘোরের মধ্যে লিলি আস্তে আস্তে চোখ মেলল, তাকাল তার বুকের উপর চেপে শোয়া নেই দস্যুর মুখের দিকে। লোকটার চেহারা, পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির প্রশান্তিতে

বিশ্রান্ত কিন্তু সুন্দর, কৃতার্থ এবং মধুর।

ঘুম ভেঙ্গে গেল লিলির। অবাক বিস্ময়ে সে দেখল অই চেহারাটি কায়সারের। এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, এর মধ্যে নিমিষের তরেও সেই চেহারা লিলির চোখের আড়ালে যায়নি। শত চেষ্টা করেও তাকে মনের পর্দা থেকে অপসারণ করতে পারেনি।। সামান্য একটা দারোয়ানের ছেলে। তার চেহারা এমন আশ্চর্য সুন্দর শাণিত হয় কেমন করে? ও এমন কি হওয়া সম্ভব, দারোয়ানের সন্তান অন্য কারো বংশধর? গরীব সন্তানদের ঘরে এমন তো হরহামেশা ঘটে। কায়সার কি তেমনি এক অভিজাতের খেয়ালি উৎপাদন? লিলির মনে হলো তা হলেও কোন ক্ষতি নেই। তাতে অবস্থার কোন হেরফের হবে না। সাক্ষাৎকারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা দৃশ্যচিত্র চোখের সামনে খেলা করে। ইচ্ছা করে সে একটু বেশি প্রশাসন করেছিল। দেখতে চেয়েছিল। প্রশাসনের আধিক্যকে সে প্রসন্নমনে গ্রহণ করে কিনা। করেনি। অর্থাৎ একশ'তে একশ'। সে দেরি করে গেছে ইচ্ছা করে। ওতেও সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আবার একশ'তে একশ'। নীল শাড়ি পরে যাওয়ার কথা ছিল। সে গেছে গরদ রঙের শাড়ি পরে।

সে ক্ষেপে একেবারে আগুন! লিলি যখন ওকে মিথ্যা কথা বলার অপবাদ দিয়েছিল কী ভীষণ জোরে সোফার হাতলে ঘুষি মেরেছিল ডান হাতে! হাতে নিশ্চয়ই খুব ব্যথা পেয়েছিল। তার ক্রোধ ক্রোধের প্রকাশ একদম জেনুইন। তরপর যখন সে বলল একজন বড়লোকের মেয়েকে দেখার সৌভাগ্য হলো। আপনাকে ধন্যবাদ, তখনও তার কথায় একটুও উপহাস ছিল না। বরং মনে হয়েছে অন্তর দিয়েই সে বলেছে কথাগুলো। তারপর সে– দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি।

তারপর সে ওঠে ধীরে ধীরে চলে গেল। ধীরে ধীরে যেন লিলি বা সোফিয়া একটুও আহত বোধ না করে।

ওহ্, হোয়াট ক্যারেকটার। রিয়েলি। এন্ড– নিঃসঙ্কোচে সে বলে মনে মনে, আই লাইক হিম। লোকটা প্রাণবন্ত সচেতন সাবলীল....

সকালবেলা ঘরে ঢুকলেন ফুফু।

বললেন, আজকেও ঘুম হয়নি তোর লিলি?

–না, মানে–

পই পই করে বলছি, একটা ঘুমের বড়ি খা। ছয়দিন। সাতদিন হলো, তুই দিনেও ঘুমাস না, রাতেও না। এসি বন্ধ করে রেখেছিস ক্যান্‌রে! এতো গরম!

তখন মা-ও এসে আস্তে আস্তে ঢুকলেন। মা বেশি কথা বলেন না। তার সকল আদর সকল প্রকাশ চোখে। লিলির চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সেই যে ছেলেটা, দারোয়ানের ছেলে, ঠিক তো? ঠিক তো? নাকি?

ফুফু বললেন, তোর হাতে আগে তো কোন আংটি ছিল না। আংটি কই পেলি? মা তার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলেন। সেদিনই শেরাটন থেকে বেরিয়ে সোফিয়াকে বিদায় জানিয়ে পরে লিলি একা

একা আংটিটা কিনেছিল। কেন হঠাৎ এরকম খেয়াল চাপল তার মাথায় তা সে ভাল করে জানে না। ভিতরে বেশ ভারী রকমের একটা অস্থিরতা তাকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে ফেলছিল। তখন তার মনে এলো পরলে কেমন হয়? হাতে কোন একটা পাথর হয়?

পাথরের দ্রব্যগুণ আছে কিনা বোঝা যাবে। অনেকদিন আগে, এম এ পরীক্ষা তখন সামনে, এক হতচ্ছাড়া জ্যোতিষ তাকে বলছিল, আপনি গোমেধ পাথর নেবেন। মনে শান্তি পাবেন।

ফুফু বললেন, ওদের বাড়ি যা না। নিজের চোখে দেখে আয়। দারোয়ানের ছেলে কিনা। মা কথাটা মানলেন না। তিনি বলতে চাইলেন, ভাল ছেলে হলে বাবা দারোয়ান হোক না, তাতে কি যায়-আসে? তিনি সমানে নাড়লেন। বসলেন হাসিমুখে, আমাকে একবার দেখাতে পারবি?

-এটা কী পাথর রে লিলি?

-গোমেধ ফুফু

-গোমেধ পরলে কি হয়? বিয়ে হয়?

-যা! কী যে তুমি বলো না!

মা ও ফুফুর দুটো প্রস্তাবই লিলির পছন্দ।

হয়েছে। কিন্তু তার একটাও হবার নয়। কারণ কায়সারের ঠিকানা জানে না সে। কায়সারের ঠিকানা জানে যে, কাকাতুয়া তার ঠিকানাও সে জানে না। এটুকু কেবল জানে যে, কাকাতুয়া টঙ্গি থাকে। তা টঙ্গি তো ছোট্ট একটু জায়গা নয় যে, ওখানে গিয়ে কাকাতুয়া বললেই লোকে বাড়ি দেখিয়ে দেবে। না, কোনো আশা নেই। তার স্বপ্নটার কথা মনে পড়লো আবার।

মাগো! কী সুন্দর স্বপ্নের মতো স্বপ্ন!

বড় ভালো লেগেছিলো এমনি এক দৃষ্টির কাছে আদরের যাদুভরা চোখের কাছে, এমন সবল বাহুর বেষ্টনীতে সে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে চায়। বাবাকে বললে হয় না? টঙ্গি থাকে। নাম ফরিদ, এমএ পাস। বেশি কথা বলে। কিংবা লিলি উত্তেজিত হয়ে যায়। ইউনিভার্সিটিতে ইকনোমিক ডিপার্টমেন্ট গেলেই তো ঠিকানা পাওয়া যাবে কায়সারের। বছর পাঁচেক আগে থেকে দেখলেই হবে। বেশ একটা সূত্র পাওয়া গেলো। এখন বাবাকে বললেই হবে। কিন্তু বাবাকে সে বলবে কেমন করে? ফুফুকে বলা যায়।

তার আগে একটা কাজ করতে হবে।

চা খাওয়ার পর সে নিচে এলো গেটের ডান পাশে দারোয়ানের খপুড়িঘর।

ওখানে গিয়ে সে দখলো, দাড়িওয়ালা একটা লোক, খালি গা, বয়সের ভারে বেঁকে গেছে।

বিশ্রী রকম কাশছে।

-আপনি দারোয়ান?

-হ্যাঁ।

-নাম কি?

-উশন মিয়া।

-ছেলে আছে?

-আছে না? অই তো!

লিলি ডাকে, এদিকে আসো।

বয়স হবে ত্রিশ-ট্রিশ।

হলদে দাঁত বের করে কালো মুখে

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এগিয়ে এলো।

-তোমার নাম কি?

উশন বললো, কানে শোনে না।

ছেলে বললো, রিপন।

বলে ক্রুদ্ধ চোখে বাপের দিকে তাকালো।

উশন বললো, কিছু আনতে হবে আপা?

লিলি বললো, না।

সে খুব হতাশ হলো। এই হলো দারোয়ানের

নমুনা। এরই উনিশ-বিশ সংস্করণ হবে অন্য

একজন দারোয়ান। কিন্তু কায়সার, কায়সার অনেক

বড় ব্যতিক্রম।

নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলো

লিলি। অন্যমনস্ক। চটি পায়ে সাদা পাজামা চোখের

সীমানায় ধরা পড়লো। বাবা। ফজলুল হক।

বাবা বললেন তোর ফুফু বলছিলো। ওর

নাম কিরে?

লিলি কোনোমতে বললো, কায়সার। পুরো নাম জানি না। ফরিদ বলে একটা ছেলে টঙ্গি থাকে।

বাবা বললেন, গনেশকে লাগিয়ে দেবো।

একটু সময় লাগতে পারে কিন্তু সালমান খানের বাবা বাবর আলী খানকে আমি যে কথা দিয়েছি। লিলি বললো, ও খুব বাজে ছেলে বাবা। বিশ্রী বাজে কথা বলে। আমি ওকে সহ্য করতে পারি না। লিলি বাড়ির দিকে আস্তে আস্তে যেতে লাগলো। ফজলুল হক তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে বললেন, দারোয়ানের ছেলে যদি হয়, তাহলে ওখানে আমারও আপত্তি আছে। তার কোনো খবর নেয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। জীবন এতো সোজা জিনিস নয় মা, এখানে লাজুক বহু বিবেচনা আছে, তাদের পাশ কাটিয়ে কিছুই করা যায় না। তোমার পথে তুমি থাকো। আমার পথে আমি, ঘটনা ঘটবে আপন পথে।

ভেতরে লাল রঙের একটা গাড়ি ঢুকলো। গাড়ির ভেতরে সালমান খান, ঠোঁটে ঝোলানো সিগ্রেট। এতো বড় একটা জলজান্ত মানুষ ফজলুল হক। তার চোখেই পড়লো না।

গাড়ি থামল গিয়ে গাড়ি বারান্দায়। সালমান কোন্ দিকে তাকালো না– তিনটা সিঁড়ি ভেঙ্গে যে বারান্দায় উঠলো।

ঢুকে বসার পরই লিলিকে পেয়ে গেলো। ঠোঁট থেকে সিগ্রেট নামালো না সালমান। একটু বিরক্তি সহকারে বললো, একি তুমি!

রেডি হওনি?

লিলি আকাশ থেকেই পড়লো। রেডি

হবো মানে! কীসের জন্য?

সিগ্রেট ঠোঁট থেকে নামালো না সালমান। বললো, বাহ, আজকে শুক্রবার না? আজকে আমাদের জয়দেবপুর যাওয়ার কথা আছে না?

আমাদের বাগান বাড়িতে?

লিলির মনে পড়লো। বেশ কয়েকদিন আগে বলেছিলো বটে। কিন্তু কথাটা খুব সিরিয়াসলি বলেনি এমনিই আমরা একদিন জয়দেবপুর যাবো। কেমন? এরকম ক্যাজুয়াল সুর।

লিলি বললো, আপনার আব্বা-আম্মা যাবেন না?

এবার সিগ্রেট হাতে নিলো সালমান, চেহারায় বিস্ময়টাকে পুরোপুরি ধরলো। বলল আব্ব-আম্মা! ওনারা যাবেন কি করতে?

-আমরা দু'জন কেবল?

শুধু আমরা দু'জন।

অনেকক্ষণ লিলি চেষ্টা করলো স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতি প্রতিক্রিয়াকে সংহত রাখতে। তারপর নরম সুরে প্রশ্ন করল, ডিড ইয়ু টেল ইওর মম এবাউট ইট?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠলো সালমান, লিলি হক, তোমাকে আমি আর একদিন বলেছি। আমার সঙ্গে ইংরেজী বলবে না।

লিলি অনুতপ্ত হয়, সরি মনে ছিলো না।

আই এম রিয়েলি সরি।

-আবার!

-সরিও বলতে পারবো না! ঠিক আছে মিস্টার সালমান, আমি গভীরভাবে অনুতপ্ত। মনে হলো সালমান অগত্যা খুশি হয়েছে।

সে বললো, যাও, রেডি হয়ে এসো।

লিলি বললো, এভাবে আমাদের যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

-কেন, দু'দিন পরে তো আমাদের বিয়ে হচ্ছেই। কাজটা দু'দিন পরই হোক না তাহলে! সালমান বলে বসলো, কথাটা এমন করে বলছো, যেন আমরা আসল কাজ করতে যাচ্ছি।

কপালে ভ্রূ কপালে তোলে লিলি, আসল কাজ মানে!

-কচি খুকি আর কি! আসল কাজ বুঝে না।

তাহলে তুমি যাবে না? হ্যাঁ অথবা না!

লিলি বাবাকে দেখে বলে উঠলো, বাবা আসছেন। আমি একটা কথা বলে আসছি, এক মিনিট।

কিন্তু তার আগেই সালমান উঠে দাঁড়ায়। বলে, আঙ্কেল, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

বেশ তো!

ফজলুল এসে বললেন। তখন লিলির মা আর ফুফুও এসে পেছনে দাঁড়ালেন।

সালমান কোন ভূমিকা করলো না। বললো, আপনার মেয়েকে নিয়ে আজকে আমার জয়দেবপুর যাওয়ার কথা ছিলো। আপনি তো জানেন। ওখানে আমাদের একটা বাগানবাড়ি আছে। আপনার মেয়ে বলছে। যাবে না। এখনো আমাদের বিয়ে হয়নি। এখন কি আমাদের কারো এমন কোনো কাজ করা উচিত যা আমাদের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আনতে পারে?

-বাগানবাড়িতে? দু'জনে একলা?

হ্যাঁ। এরকম তো আজকাল আকদার হচ্ছে।

ফজলুল হক বললেন, হ্যাঁ, আজকাল কতোকিছু হয়।

একটু পর সালমানের চোখে চোখ রেখে বললো, আবার স্ক্যাডালও হয়। পরে বিয়ে হয় না। লোক জানাজানি হয়। সালমান রেগে যাচ্ছে। এটা বুঝতে পারলেন কেবল ফজলুল হক।

যে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে বললো, আপনি চোধহয় বোকদার সাহেবের বড় মেয়ে শেফালির কথা বলছেন। কিন্তু ওর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। মেয়েটা নষ্ট চরিত্রের ছিলো। ওটা জেনেই ওর সঙ্গে আমি মেশা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যাক সেসব কথা। এখন লিলি কি আমার সঙ্গে যাবে না?

ফজলুল হক বললেন, সেটা লিলির ইচ্ছা। আমি হ্যাঁ, না কিছুই বলবো না।

লিলির ফুফু সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন লিলি যাবে না।

লিলির মা প্রচণ্ড বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন।

সালমান লিলির দিকে তাকালো, লিলি! লিলি বললো, আমি আপনার সঙ্গে যাবো!

লিলির মা ছুটে এসে তার গালে প্রচণ্ড বেগে একটা চড় মারলেন, গর্জন করে উঠলেন, না!

উঠে দাঁড়ালো সালমান, ফজলুল হকের ওপর রক্তচক্ষুর আগুন ধর্ষণ করলো, বললো এর মূল্য আপনাকে দিতে হবে।

গ্যাট গ্যাট করে চলে গেলো সালমান। নিচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিধ্বস্ত ফজলুল হক। লিলি ধীরে ধীরে তার কাছে এল। সে বাবার একটা হাত তার হাতে নিল। তারপর আস্তে করে ডাকল বাবা।

হু হু করে কেঁদে উঠলেন বুড়ো মানুষটা। লিলিকে বুকে টেনে নিলেন। কোন মতে টেনে টেনে বললেন, আমি জানতাম না ওরা এত অসৎ। ওদের সঙ্গে একই ব্যবসায় নেমেছিলাম। শিপিংয়ের। পার্টনারশিপে। আমার তিন কোটি টাকা এক বছরে শেষ হয়ে গেল। ওরা বলছে ওদের দুই কোটি টাকা আমি নিয়েছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, লিলি–

–বাবা চুপ করো সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি বাবা। কাঁদে না ছিঃ।

–ওদের জালে আমি আটকে গেছি। লিলির মা কাছে এলেন, বললেন, আমরা আছি। ভয় পেয়ো না।

ব্যাংকের পিয়ন ভদ্রলোক দেখামাত্রই কায়সারকে চিনল। তাকে সম্ভাষণ করল, সেলামালেকুম। কেমন আছে স্যার?

–ভাল। আপনি ভাল তো?

–স্যার, আমাদের ভালমন্দ স্যার, বুঝলেন তো–?

–আপনার নামটা যেন কি?

মুন্সি মিয়া স্যার। মোহাম্মদ আব্দুল মুন্সি মিয়া। পকেট থেকে পাস বের করে একটা একশ' টাকার নোট বের করল। নোটটা একটু পুরনো। তারপর দেখে শুনে নতুন একটা নোট বের করে মুন্সি মিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরে কায়সার। মুন্সি মিয়া প্রায় লুফে নিল নোটটা। বলল, বায়োডাটা ফটোকপি করে নিয়ে আসবো?

কায়সার বুঝতে পারে না। মাথাটাথা ঠিক আছে তো?

কীসের? কার?

মুন্সি মিয়া মাথা চুলকাল, লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আমি স্যার সব জানি আপনার বান্ধবী সোফিয়া দীন আপনার বায়োডাটার ফটোকপি নিয়ে গেছে। এখন ওনার বায়োডাটার ফটোকপি আপনার লাগবে। তাই তো স্যার? তাই না?

আপনি একটু বসেন।

কায়সার দাঁড়িয়ে রইল। ওর ওখানে বসেছিল সোফিয়া। আর অই কোণাটায় দেয়ালে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর ওদিকে তার চোখ যেতে সে দেখল, ও তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মেয়েটাকে তার ভাল লেগেছিল। আর এই ভাল লাগার ব্যাপারটা তার ভাল লাগছিল না। সেজন্য সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু লিফটটা ঠিক সময়ে আসেনি বলে এত সব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

মুন্সি মিয়া একটা কাগজ এনে তার হাতে দিল। বলল, দেখুন তো স্যার টিক আছে কিনা।

কাগজটায় এক নজর চোখ বুলাল কায়সার। প্রথমে ছোট অক্ষরে বায়োডাটা সব, তারপর বড় হাতের বড় অক্ষরে সোফিয়া দীন।

সে বলল, ঠিক আছে। উনি কবে এসেছিলেন?

বুধবারে ইন্টারভিউ হল তো!

উনি এলে শনিবারে। দু'দিন পর। আর আপনি আসলেন আবার শনিবারে। তার মানে দশ দিন বাদে।

–ইন্টারভিউটা কবে হবে জানেন?

–ঠিক নাই স্যার, একদম ঠিক নাই।

মন্ত্রী আর এমডির মধ্যে লাগালাগি তো! একবার মনে হয় এমডির চাকরি বুঝি গেল। আরেকবার মনে হয়, মন্ত্রীই বোধ হয় আউট হয়ে গেল! বাঘে বাঘে যুদ্ধ, বুঝলেন না–

মুন্সি মিয়া খুব হাসল, মুখে হাত চাপা দিয়ে

এক নম্বর খবর, সোফিয়া তার হাঁড়ির সব খবর নিয়ে গেছে আট দিন আগে। তার জীবনবৃত্তান্তে একটা টেলিফোন নম্বর ছিল। দ্বিতীয় খবর, সে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

সোফিয়ার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলবেন মিনহাজ সাহেব সে সুযোগ লাভে গতকাল থেকে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। রাজিয়া সব সময় তার সঙ্গে লেগে আছে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা তার কাছাকাছি থাকা চাই। মিনহাজের কোন প্রয়োজন তিনি আর কাউকে দিয়ে মেটাতে চান না। সেই প্রথম থেকে। কিংবা তারো আগে

থেকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে যেমন মানুষের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে থাকে, তেমিন। রাজিয়ার সঙ্গে কামালের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সহপাঠী বন্ধু কামাল। সেই কামালই মিনহাজকে নিয়ে গিয়েছিল রাজিয়াদের বাড়ি। তারপর কী যে হয়ে গেল, রাজিয়া জিদ ধরে বসল, সে মিনহাজকে বিয়ে করবে, কামালকে নয় এবং এই ব্যাপারটাকে কামাল এখনো মিনহাজের শয়তানি বলে মনে করে। মনে করে, মিনহাজ তার সঙ্গে বিট্রে করেছিল, তার পছন্দের মানুষকে সিডিউস করে নিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত অবস্থায় মিনহাজ মোটেই রাজিয়াকে প্রভাবিত করেনি, সবটা ব্যাপার রাজিয়ার মনোগত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তার প্রাণের দোস্ত, কামাল এখন জানের দুশমন। রাজিয়ার সেই বিবাহ-পূর্ব ভালবাসার তীব্রতা, অবাক কাণ্ড, বিবাহের পঁয়ত্রিশ বছর পরও বহাল আছে। বাথরুমে গেলেও মনে হয়, রাজিয়া মরিচ পোড়া দিয়ে গেছে, দ্রুত বের হয়ে আসে। বোধ হয় মিনহাজ সমূলেই কেবল রাজিয়া নিজেকে উদ্বেগমুক্ত মনে করে।

বাথরুমেই ঢুকেছিলেন রাজিয়া।

মিনহাজ চট করে ঢুকে পড়লেন সোফিয়ার ঘরে। কোন ভনিতা না করে বললেন, হ্যারে, তুই ব্যাংকে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে গেছিলি?

–হ্যা আব্বা।

–কেন, হঠাৎ চাকরির দরকার পড়ল কেন?

–বসে বসে থাকি, ভাল লাগে না। তুমি কি করে জানলে?

মিনহাজ সাহেব গজগজ করলেন, বসে বসে থাকি, ভাল লাগে না, সেই জন্য ব্যাংকে চাকরি নিতে হবে? লিখিত পরীক্ষা দিলি, আমাকে বললি না ক্যান?

সোফিয়া বিব্রত বোধ করে বলে, বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সব সময় আম্মা এমন লেগে থাকে,–

মিনহাজ সাহেব হাসলেন, বললেন, বসে বসে সময় কাটে না, আমাদের কোম্পানীতে বসলেই পারিস। ওখানে তুই তো একজন ডিরেক্টর। একটা রুম ঠিক করে দেবো তোকে। দিন সাতেক সময় লাগবে।

সোফিয়া একটু সময় নিল। কিন্তু বেশি সময় নেওয়া যাবে না। সে বলে ফেলল, আমার এক বন্ধু আছে আব্বা, তাকে কোথাও একটা চাকরি দেওয়া যাবে আব্বা?

সেই সময় রাজিয়া এসে প্রবেশ করলেন। তিনি ঢুকেছেন। আর তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা তাকে কৌতূহলী করে তুলবে। মিনহাজ সাহেব প্রশ্ন করলেন, মেয়ে?

–না।

–অ। কেরিয়ার কি রকম?

–ভাল খুব ভাল।

মিনহাজ সাহেব একটু ভাবলেন। বললেন, সিলেট যাবে? চা বাগানে?

জিজ্ঞেস করে দেখব।

রাজিয়া প্রশ্ন করলেন, কে রে? কার কথা বলছিস?

সোফিয়া বলল, একটা ছেলে আম্মা। খুব গরীব। এমএ পাস করেছে। চাকরি পাচ্ছে না।

–তোর সাথে কোথায় দেখা হল?

–ইউনিভার্সিটিতে।

–ভালো ছেলে? দেখতে কেমন?

সোফিয়া বলে আহ, বললাম, গরীব মানুষের ছেলে। আবার এতো কথা জিজ্ঞেস করে।

সোফিয়ার মোবাইল বাজল।

সোফিয়া ফোন অন করে বলে,

হ্যালো।

কেমন আছিস রে সোফি? সেই যে গেলি একবার একটা ফোন করলি না। শোন, অই যে কাকাতুয়া, ওর সঙ্গে তো পরিচয় আছে?

সোফিয়া চমকে উঠে, না তো?

–ওর ঠিকানা আছে?

–ও মা! আমি ঠিকানা পাবো কোথায়? কেন, হঠাৎ ওর পেছনে লেগেছিস ক্যান?

লিলি জানে প্রশ্নটার কোন সদুত্তর সোফিয়া দিতে পারবে না। তবু সে জিজ্ঞেস করল, সেই যে সেদিন শেরাটনে লোকটার সঙ্গে দেখা হলো, মনে আছে? ও কোন সনে এমএ পাস করেছিল, তুই জানিস?

সোফিয়া আকাশ থেকে পড়ার ভান করল, অ মা! এমএ পাস নাকি?

লিলি ফোন রেখে দিল।

সোফিয়ার ভুরুতে আপনা আপনি কুঞ্চন উঠল। বিষয়টা কি? কায়সারের সঙ্গে তো সেদিনই লিলির চুকে বুকে গেছে। কোন সনে এমএ পাস করেছে সেটা জানার জন্য বেকারার হয়ে গেল কেন? আর কাকাতুয়াকেই বা কি জন্য দরকার? সোফিয়ার ভিতরে সব গোলমাল হয়ে যায়। চেয়ারে বসে সে গভীরভাবে ভাবল। তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিল।

সে ফোন অন করল।

–হ্যালো। কায়সার সাহেব– বলছেন?

–হ্যাঁ।

–আমি সোফিয়া। সোফিয়া দীন। সেই যে ব্যাংকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখা হলো, মনে আছে?

কায়সার বলল, সেটা ছিল দ্বিতীয় দিন। প্রথম দিন ছিল শেরাটনে।

সোফিয়া মনের সব জড়তা কাটিয়ে বলল, আজ দুপুরে কোথাও কোন কাজ আছে?

–না।

একটার সময় সোনারগাঁয়ে আসবেন?

কায়সার বলল, না।

সোফিয়ার বুখ ধড়াক করে ওঠে। না, মানে কি?

–না কেন?

–ধানমন্ডিতে একটা চাইনিজ আছে।

এক সময় খুব লোকজন যেতো। এখন ওখানে খুব একটা ভিড় হয় না। নিরিবিলি। যদি বলেন, একটার সময় ওখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো।

সোফিয়া একটা প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করল না। বল, আকাশে খুব মেঘ করেছে। যদি বৃষ্টি হয়?

–আপনাকে আমি কথা দিয়েছি, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। বৃষ্টি হলে ভিজবো।

একটা ট্যাক্সি এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াল।

সোফিয়া সাধারণ একটা হালকা সবুজ শাড়ি পরেছে। সে ট্যাক্সির দিকে এগোচ্ছে।

রাজিয়া প্রায় দৌড়ে এসে তাকে ধরলেন, একি? গাড়ি নিচ্ছিস না?

–না আম্মা। ইউনিভার্সিটিতে গোলমাল হচ্ছে। গাড়ী নিলে ভাঙবে।

–খেয়ে গেলি না?

–আমি এক্ষুণি চলে আসবো আম্মা।

ট্যাক্সি চলে গেল।

রাজিয়া ওখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। ভাবছেন, সঙ্গে গেলেই পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হররোজ গোলমাল হয়। গোলাগুলি হয়। কবে যে কি বিপদ হয়। মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, ওকে দেখো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে সোফিয়া দেখল, কায়সার দাঁড়িয়ে আছে।

নীল রঙের শর্ট, সাদা প্যান্ট, চোখে রোদ চশমা। সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে সে হাত উঠল। সোফিয়াও হাত উঠিয়ে জবাব দিল।

ভিতরে ঢুকে সোফিয়া খুশি হয়ে উঠল। লোকজন নেই পরিত্যক্ত কোন আবাসের মতো। সব আছে সাজানো। চেয়ার, টেবিল, গ্লাসের ভেতর লাল ন্যাপকিন ডিজাইন করে ঢোকানো, নেই কেবল মানুষ।

একজন বেয়ারা এসে দু'জনের হাতে দুটো মেনু দিয়ে গেল।

সোফিয়া মন দিয়ে পড়ে।

–কোন স্যুপ পছন্দ করেন আপনি?

–আপনি যা দেবেন তাই-ই আমি পছন্দ করে খাবো।

সোফিয়া অর্ডার দেওয়া শেষ করে।

তারপর তাকায় কায়সারে দিকে। বলে, আমি ভেবেছিলাম, আপনি টেলিফোন করবেন।

কায়সার বলল, হ্যাঁ আমিও ভেবেছিলাম।

একটু পরে বলল, কিন্তু করিনি, ভয় হলো, সঙ্কোচ হলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, না থাক। ঘটনাকে ত্বরান্বিত করা ঠিক হবে না। যদি কিছু ঘটে, আপনা-আপনি ঘটুক। তবে–

সোফিয়া ওর দিকে তাকায়।

–তবে আপনি ফোন করাতে আমি বেঁচে গেলাম। আমি জানি, আপনার ফোন করা ও এখানে আসা স্রেফ আমার কাছে আপনার ঋণ শোধ করার মতো সামান্য একটা ঘটনা মাত্র।

সোফিয়া বলল হাসতে হাসতে, আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না যে আপনি বেশি কথা বলেন।

কায়সার জিজ্ঞেস করে। কথাটা সত্যি নয়?

সোফিয়া কোন মতে বলে, সত্যি মানে, আমি ঠিক,–

–তাহলে আমার একটা কথা রাখবেন কি? ভেবে দেখুন। আজকের বিলটাও আমি দেবো। তাহলে আজকেই সব শোধ-বোধ হয়ে যাবে না। তাহলে অন্তত আরো দু'দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

সোফিয়া মনে মনে হার মানল। লোকটাকে সে যত সহজ-সরল ভেবেছিল অতটা সে নয়। বরং কথাগুলো বেশ চতুরই শোনাল।

সে বলল, কিন্তু সেদিন আপনি এতগুলো টাকা দিলেন। আজকেও আমি এতগুলো অর্ডার দিলাম। আপনার কাছে টাকা কি আছে? আপনার তো চাকরি এখনো হয়নি।

কায়সার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে, আপনার সঙ্গ থেকে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন দেখি, তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চান্স ঘটছে, তখন আমি বলব, আমার কাছে টাকা নেই। তখন আমি কেবল খাবো আর আপনি বিল দিয়ে যাবেন। চলবে?

সোফিয়া বলে আজকে আমি দিই। প্লীজ! বেশ। তাহলে আজকেই শেষ রজনীতো! ওরা নীরবে একটার পর একটা আইটেম শেষ করতে লাগল। স্যুপ, ওয়ানতাং, ফ্রায়েড রাইস, ফ্রায়েড চিকেন, সুইট এন্ড সাওয়ার, প্রন্, চিকেন উইথ চিলি এন্ড ভেজিটেবল.....

বিল শোধ করল সোফিয়া।

ওরা উঠবে।

কায়সার বলল, আর যদি কোন দিন দেখা না হয়–

দেখা হবে।

তবু বলে রাখি। না বলা পর্যন্ত আমি কিছুই ভাল করে করতে পারছি না।

বলে কায়সার চুপ করে গেল।

সোফিয়া মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর সে মাথা তুলে কায়সারের দিকে তাকালো।

কায়সার তার চোখে চোখ রাখল।

বলল, আপনাকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার মনে হয়েছিল, এই একজন মানুষ পেলাম, এর জন্য সব কিছু করা যায়, জীবন দেওয়া যায়।

কিছুক্ষণ কায়সারের দিকে তাকিয়ে রইল সোফিয়া। তারপর ফুঁপিয়ে উঠল।

একি! আপনি কাঁদছেন?

সোফিয়া বলে, কেন কান্না এল আমি জানি না। আমি ইচ্ছা করে কাঁদিনি। আপনার সঙ্গে আমার আরো অনেকবার দেখা হবে। দেখা না হলে বাঁচব না। আবার ফুঁপিয়ে উঠে সে।

চার

দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, কিন্তু লোকটা ঢুকবেই। লোকটা বলে শোন, তুমি একজন সাধারণ দারোয়ান। তোমার তো মাথায় সে রকম কিছু থাকার কথা নয়। তোমার যে মনিব তিনি আমাকে চেনেন। আমি তার কাছে এসেছি। বুঝেছো? তারই কাজে। সুতরাং তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। যদি না ছাড়ো তোমার স্মল চাকরিটা নট হয়ে যাবে।

তোমার নাবলক বাচ্চারা না খেয়ে মরবে। তোমার বউ বিধবা হবে। এসেই পথ ছাড়ো।

লোকটা ভিতরে ঢুকে গেল। ঢুকে একেবারে বসার ঘরে। মিনহাজ সাহেব বসে ছিলেন বসার ঘরে। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, কে আপনি?

–ফরিদ। আমি ফরিদ। ঘটক। এখন চিনতে পারছেন না। কিন্তু একদিন চিনবেন সত্যি। আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনার মেয়ের জন্য। শোনেন স্যার, এসব কাজ অল্প কথায় হয় না। আমি এই বয়সে এই পর্যন্ত একশ' একাত্তরটা কেস করেছি, কোনটাই অল্প কথায় হয়নি। অল্প কথা বললে কেউ ঘটক বলে মানতেই চায় না। চায়ের অর্ডার দিন।

মিনহাজ সাহেব বললেন, ছেলে কি করে?

–করে মানে? করবে কেন? করায়! বিরাট জমিদার ছিলেন তার বাবা। এখন জমিদারী নেই, কিন্তু জানেন তো স্যার হাতি মরলেও লাখ টাকা! কিছু করতে হয় না। শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্র আভিজাত, ধনী এবং সৎ। আর কি চান আপনি, খালু?

তখন সোফিয়া ঢুকল।

তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। ফরিদ বলল, এই বুঝি আপনার মেয়ে! বাহ্। আপনি এক কাজ করুন। আপনার একটা বায়োডাটা–

মিনহাজ সাহেব অবাক হলেন, বিরক্ত হলেন, বললেন, আমার বায়োডাটা দিয়ে কি হবে? ফরিদ বলল লাগে, লাগে। এই বায়োডাটায় থাকবে, আপনি পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সে কি ছিলেন আর পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরে কি হয়েছেন। কিভাবে হয়েছেন–

সোফিয়াও বিরক্ত হয়, লোকটা কে আব্বা?

–তুই চিনিস না?

–না তো!

লোকটা বলল, আমার নাম ফরিদ। চেনার কোন কারণ নেই। আমি এমএ পাস। ঘটকালি করার চেষ্টা করি। কারণ–

সোফিয়া সাবধানে বলে কাকাতুয়া?

হ্যাঁ আমিই। অই নামটা আপনি জানলেন কেমন করে?

রাজিয়া এসে সোফিয়ার পাশে বসলেন। বললেন, ছেলের ছবি এনেছেন?

কাকাতুয়ার প্রদীপের কেরোসিন মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। সে বলল। ছেলের ছবি তো পরে আসে, আগে মেয়ের ছবি দিন।

রাজিয়া বললেন, যা, একটা ছবি নিয়ে আয়।

–আর একটা বায়োডাটা।

সোফিয়া বলল, এক সপ্তাহ সময় লাগবে।

তৈরি নেই?

মিনহাজ বললেন, একটু চা-টা দেবে না?

রাজিয়া উঠে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। কুলসুম তার আগেই তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কুলসুম বলল, মিষ্টি দেবো?

–দে।

সেকেলে বাড়ি, বাসা নয়।

গেট খোলা। ঢুকে বাঁ-দিকে একটুখানি বাগানের মতো। গোলাপ ফুটে আছে। লিলি কলিং বেল টিপল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন কামাল সাহেব।

–কাকে চান?

লিলি কামাল সাহেবের গম্ভীর সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে

কামাল সাহেব বললেন, তুমি ভিতরে এসো মা।

লিলি ভিতরে ঢোকে।

রিবাট হলঘর। প্রাচীনকালের সব ফার্নিচার। এক জায়গায় পুরো একটা বাঘ দাঁড়িয়ে আছে।

কামাল সাহেব বললেন, তুমি কাকে চাও?

–কায়সার সাহেব, এই বাসায় থাকেন?

–হ্যাঁ। আমার ছেলে।

ভিতরের দিক থেকে রওশন ঢুকলেন। বললেন, কে? লিলি বলল, আপনার ছেলে!

রওশন বললেন, অমা! তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? আমাদের একটা ছেলে থাকতে পারে না? তুমি কে?

–আমার নাম লিলি। আমি গুলশানে থাকি।

–কায়সারের সঙ্গে তোমার কি দরকার? রওশন প্রশ্ন করেন। লিলি ঘামছে। এ কোথায় এসে পড়ল সে। তবু সে নিশ্চিত হতে চায়, বলে, এই বাড়ি তো আপনার নিজের খালু?

কামাল সাহেব হাসলেন, বললেন, না মা। নিজের নয়।

না, মিথ্যা কথা বলেনি কায়সার।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লিলির। মিথ্যা কথা বলেনি কায়সার। বলতে পারে না। মিথ্যে কথার ছেলে নয় সে।

কামাল সাহেব বললেন, এটা আমার বাবার বাবার বাড়ি। এখন আমি এর দেখাশোনা করি। কেয়ারটেকার। দারোয়ান বলতে পারো। আমার পরে এ বাড়ির দারোয়ান হবে কায়সার।

লিলি আর শুনতে চায় না। যা জানতে চেয়েছিল সে, তা জানা হয়ে গেছে। সে উঠল।

–একি উঠছো কেন? বসো।

রওশন উদ্বিগ্ন হলেন।

তখন গেটের ভিতরে একটা গাড়ি ঢুকল। গাড়ি থেকে নামল কায়সার। সে ঘুরে এসে অন্য দরজাটা খুলে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল সোফিয়া।

লিলির বিস্ময় আকাশচুম্বী। সে সহ্য করতে পারে না। বাইরে এসে সে ওদের সামনে দাঁড়াল। কায়সারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আপনি!

সোফিয়া বলে, তুই!

লিলি কোন কথা বলল না। সে ওদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর পেছন ফিরে কামাল আর রওশনের দিকে একবার তাকিয়ে পরে গেট পার হলো। বড় রাস্তায় লিলির গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার পর কাকাতুয়া গাড়ির সামনের সীট থেকে নামল।

তিনটে প্রশস্ত সিঁড়ির পর বারান্দা। বারান্দায় একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন রওশন ও কামাল। তাদের কায়সার ও সোফিয়া দেখল। সোফিয়া কায়সারের দিকে তাকাল। তার চোখে-মুখে ভয়। অনিশ্চয়তা। কে আগে যাবে?

কাকাতুয়া এসে পরিস্থিতির চালকের আসন নেয়। সোফিয়াকে নির্দেশ দেয় আপনি আগে যান।

সোফিয়া বারান্দায় উঠে।

কামাল সাহেব বললেন, তুমি কে?

–আমি সোফিয়া।

পেছন থেকে কায়সার বলল, ওকে বেশি প্রশ্ন করো না বাবা, ভিতরে যাও। আমি সব বলছি। আয় কাকাতুয়া।

ভিতরে এসে কামাল ও রওশন বসলেন। দাঁড়িয়ে বাকি কয়জনা। ঠিক আসামীর মতো নয়। সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

সোফিয়া বলল, রান্নাঘর কোন দিকে?

কায়সার ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সোফিয়া ওদিকে যেতে চায়। কামাল সাহেব বললেন দাঁড়াও।

সোফিয়া বলল, এই সময় আমার চায়ের তেষ্টা হয়। এখানেতো কাউকে দেখছি না। যদি বলেন, আপনাদের জন্যও বানিয়ে আনতে পারি।

রওশন, না। তুমি এখানে দাঁড়াও। কি ব্যাপার কায়সার?

কায়সার বলল, ওকে আমি ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি।

কামাল ও রওশনের চোখ বড় হয়ে গেল।

কামাল সাহেব প্রশ্ন করেন, ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিস মানে!

সোফিয়া বলল, আসলে ও ভাগিয়ে আনেনি। আমি ওর সঙ্গে চলে এসেছি।

–কেন?

–বাবা ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেব না।

কাকাতুয়া ওদের ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। বলল, ওদের কোন দোষ নেই খালু। সব দোষ আমার। আমিই

ওদের বলেছি তোরা যখন ভালবাসিস, ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু নেই। যা চলে যা।

কামাল সাহেব বললেন, কাজটা তুই ভাল করিসনি কায়সার। যা মেয়েটাকে ফেরত দিয়ে আয়।

সোফিয়া বলল, আমি যাবো না। এভাবে যারা চলে আসে তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না।

রওশন বলল, কিন্তু সব মানুষের মান-সম্মান বলে একটা বস্তু আছে। ইজ্জত বড় বাজে জিনিস। কেউ হারাতে চায় না। একবার হারালে আর ফেরত পাওয়া যায় না। তুমি বরং চলে যাও। আমরা তোমার বাবা-মার কাছে যাবো। সসম্মানে নিয়ে আসবো তোমাকে।

কাকাতুয়া বলল, এমন ছোট লোক আমি আর দেখিনি।

কামাল সাহেব বললেন, ছোট লোক! আমি!

–আরে না না খালু। এই মেয়েটার বাপ। বলে চাকরি করে না। বাড়ির অবস্থা ভাল না। এর কাছে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলবেন।

কামাল সাহেব বললেন, তা সব ভাল বাবারা বলতেই পারে। যাও মা, তুমি ফিরে যাও। যা কায়সার। পাগলামি করিস না। যা ওরা যদি থানা-পুলিশ করে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

সোফিয়া এসে রওশনের পাশে ধপ করে বসে পড়ে। সে কাঁদতে শুরু করে। আমি যাবো না আমি যাবো না.....

কামাল বললেন, তা হয় না। থানা-পুলিশ করলে আমাদের খুব হ্যারসমেন্ট হবে।

কাকাতুয়া বলল, ওকে খালু ফেরত পাঠাবেন না। যদি পাঠান তাহলে ওর বাবা আপনার নামে কেস করবে। কি বলেছে জানেন সেই সেই লোক? বলে কামাইলার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়োর চেয়ে মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলবো।

কামাল সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। কোন মতে বলেন, আমাকে চেনে নাকি?

কাকাতুয়া বলে, চেনে মানে ভাল করে চেনে! যে সব গালি আপনাকে সে দিয়েছে ছিঃ কানে শোনা যায় না খালু।

কামাল সাহেব সোফিয়াকে প্রশ্ন করেন, তোমার বাবার নাম কি?

জনাব মিনহাজ উদ্দিন।

রশওন বলনে, মা-র নাম?

–রাজিয়া দীন।

উঠে দাঁড়ালেন, তাকালেন সোফিয়ার দিকে।

বললেন, তোমাকে আর কোনদিন কোথাও যেতে হবে না। তুমি এখানে থাকবে। এই কাকাতুয়া না কি যেন কাজী সাহেবকে নিয়ে এসো, যাও। বিয়ে দেবে না! ওর বাপ দেবে! শয়তান!

রওশন বলল, চলো, রান্নাঘরে চলো সোফিয়া।

কাকাতুয়া আর কায়সার চোখে চোখে কথা বলল, তারপর দু'জন বেরিয়ে গেল।

কাকাতুয়া বলল, বলিনি তোকে। সমাজে চলতে গেলে অভিনয়ের দরকার আছে। মিথ্যা কথা, অভিনয়, রিহার্সেল– সব কিছুর দরকার আছে। দেখলি না কেমন সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

লিলি সালমানের সঙ্গে জয়দেবপুরে বাগানবাড়িতে এসেছিল। স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে। বাবা যেখানে কথা দিয়েছেন, সেখানে বাবার কথা শিরোধার্য। সালমান এসে বিলম্ব করেনি। ইচ্ছুক লিলিকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিছানায়। লিলিকে নিচে ফেলে তার ওপর নিজের দেহভার চাপিয়ে দিয়েছিল সালমান। লিলির ডান হাত একটা ছোরা নিয়ে প্রচণ্ড বেগে বসে গেল সালমানের পিঠে। সালমানের পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল। লিলি থামল না। উপর্যুপরি আঘাতে সালমানের দেহ ছিন্নভিন্ন করল সে।

লিলি এখন হাজতে আছে। মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে তার। সোফিয়া আর কায়সার ওকে দেখতে গেছিল। ওখানে তার বাবা-মা ও ফুফু ছিলেন। কায়সারের দিকেই কেবল লিলি একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। চোখ ফেরায়নি। কোন কথা বলেনি।

কথা বলেছিলেন লিলির বাবা ফজলুল হক কায়সারের দিকে তাকিয়েই। কারণ কায়সারকে তিনি চেনেন না। তিনি বললেন, বোকা মেয়ে, ভালবাসা পায়নি বলে আত্মহত্যা করল। এটা পরিষ্কার আত্মহত্যা! এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে ভালবাসা দেয়? জোর করে আদায় করে নিতে হয়। আর অই ছেলেটাই বা কেমন। কি হতো, ওকে একটুখানি ভালবাসলে? কী এমন অশুদ্ধ হতো...

পাগলের মতো তিনি বলে যাচ্ছেন।

কায়সার আর সোফিয়া নিঃশব্দে চলে এলো।

কেমন একদৃষ্টে কায়সারের দিকে কেবল কায়সারের দিকে তাকিয়ে ছিল লিলি। কিছুতেই মন থেকে ওর সেই একনিষ্ঠ ও সুস্থ দৃষ্টি অপসারিত করতে পারছিল না কায়সার এবং লিলির বাবা ফজলুল হকের একটানা পাগলের মতো কথাগুলোও থেকে থেকে তার কানে বাজছে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল কায়সারের।

কার কাছে ভালবাসা চেয়েচিল লিলি? তার কাছে কি? সেইজন্যই তাদের বাসায় গিয়েছিল? গিয়ে তাকে আর সোফিয়াকে একত্রে দেখে তার সব গোলমাল হয়ে গেল? জয়দেবপুরের বাগানবাড়িতে একটা লম্পটের সাথে যাওয়ার মানেই তো পরিষ্কার আত্মহননকে কবুল করে নেয়া। আর সজ্ঞানে একজনকে হত্যা করে ধরা দেয়া? তার নাম কি?

কায়সার বলল, তুমি একটু দাঁড়াও সোফিয়া, আমি আসছি।

বলে অপেক্ষা করল না। প্রায় ছুটে এল হাজতের সেই ঘরটায়। সে এসে দাঁড়াল। লিলি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

কায়সার ডাকল, লিলি?

চমকে উঠল লিলি। তাকাল তার দিকে। ঝলসে উঠল তার চোখ। কায়সার গরাদের কাছে এগিয়ে আসে। এসে ওর কাছে দাঁড়ায়, একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। দুই হাতে লিলি সেই হাত চেপে ধরে।

লিলি বলল, তুমি আমাকে বাঁচাবে কায়সার, যদি বাঁচাও আমি বাঁচতে চাইব। আমি বাঁচব। সত্যি করে বল, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না, আমাকে করুণা করে বলো না, সত্যি করে বলো।

কায়সার তার দিকে অনেক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আমি তোমাকে ভালবাসব লিলি। যতদিন বাঁচি, আমি তোমাকে আমার মতো ভালবাসব। বুকের গভীর অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো লিলির। সে হাসল। বলল, এখন মরতেও আমার আর কোন কষ্ট হবে না কায়সার। কায়সার, কায়সার ...।